নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বিশ্ব বিশ্বাস

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, [illegible] রো, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক :

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

৫ ১এ, কলেজ রো

কলিকাতা - ৯

দ্বিতীয় প্রকাশ :

চৈত্র—১৩৬৭

মুদ্রাকর :

শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ

দি নিউ কমলা প্রেস

৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

"আমাদের যা বলবার কথা হাজার হাজার বছর আগে আমাদের ঋষিরা তা বলে গেছেন। সমস্ত দেশের অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি (সুভাষচন্দ্র) এসেছ। আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিয়েছে সেই আসনের বার্তা রয়েছে ঋষিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতরে—তাঁদের বাণীতে তুমি পেয়েছ তোমার আসন ;......"

—রবীন্দ্রনাথ

বন্দীমানবের মুক্তি-যোদ্ধা

সুভাষচন্দ্র

আবিষ্কারের নেশায় পাগল ইউরোপের মানুষ—অর্থ আর রাজ্যের লোভে ইউরোপের মানুষ এল একদিন প্রশান্ত মহাসাগরের জলে। গড়ল দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষরা ইউরোপীয় বণিকদের খেত-খামারে, জঙ্গলে, কলে হ'ল গোলাম। মূক মানুষের দল—অসহায়, পরাধীন···· মুক্তির কামনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষদের নিকট আকাশ কুসুম কল্পনা।

পরিবর্তনশীল পৃথিবী। মানুষ ও জাতির ভাগ্যও তেমন পরিবর্তনশীল। সুদূর প্রাচ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের শোষণের একচেটিয়া অধিকারে হঠাৎ হল একদিন আঘাত।

···দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল-ছায়া নামল সারা পৃথিবীর বুকে। সুদূর প্রাচ্যে শুরু হল জাপানের জয়যাত্রা।

বৃটিশের নৌশক্তির দম্ভ চূর্ণ হ'ল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে। বৃটিশ, ফরাসী ও ডাচের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হ'ল ধ্বংস।

পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গোলামীর শিকলপরা দিশেহারা মানুষের দল অকস্মাৎ শুনল সিঙ্গাপুরে ভারতের নিরুদ্দিষ্ট বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে স্বাধীনতার আহবান।

সেই দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র। সিঙ্গাপুর থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে নদ-নদী, অরণ্য-পর্বত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের জন্য অগ্রসর হলেন সর্বাধিনায়ক সুভাষ। আড়াই মাস চলল মুক্তি-ফৌজের পথযাত্রা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ছবি ভাসল পথে, প্রান্তরে, লোকালয়ে। দেশীয় শাসক ও বিদেশীয় ঔপনিবেশিকদের মিলিত শোষণে পীড়িত ক্রীতদাস মানুষের দল পেল মুক্ত-মানুষ হবার উৎসাহ ও প্রেরণা। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্ত বুক হ'ল অশান্ত।

…নব নব বিক্ষুব্ধ জাতির তাই আজ অভ্যুদয় সুদূর প্রাচ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে।

এশিয়ার এই নব জাগরণের দূত, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির এই আলোড়নের হোতা সুভাষচন্দ্র।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি সুভাষ।

মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাই বলেছেন—

"He (Subhaschandra) has raised us from dust."

অর্থাৎ, তিনি (সুভাষচন্দ্র) আমাদিগকে ধুলিশয্যা থেকে উত্তোলিত করেছেন।

পরাধীন ভারতের মুক্তি-বিধায়ক—সুভাষচন্দ্র

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস প্রাণময়। কর্ম-প্রতিভা ও আত্মদানে শত শত নায়ক ও শহীদ গড়ে তুলেছেন এ ইতিহাস। সে ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের নাম স্বকীয় বৈশিষ্টতায় উজ্জ্বলতম।

স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্র এমন এক পথ গ্রহণ করেন যা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। সুভাষচন্দ্র সম্যক অনুধাবন করেন যে শাসক ইংরাজের বিপদ ভারতের স্বাধীনতার অপূর্ব সুযোগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এসেছিল সেই সুযোগ নীরবে, নিভৃতে অপূর্ব তিতিক্ষার সাথে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার পূর্ব থেকেই এই সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হন। সুভাষচন্দ্রের এ গোপন প্রস্তুতি যেমন অপূর্ব, তেমন রহস্যময়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় বিপ্লবীগণ বাঘা যতীন প্রমুখ নেতাদের নায়কত্বে জার্মানীর অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যে ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘটাবার ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু যথাযথ সংগোপনতার অভাবে সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এই সংগোপনতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি যথাসময় ভারত ত্যাগ করে ইংরাজের শত্রুশিবিরে পৌঁছতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শাসক ইংরাজের বিপদের সুযোগ যদি সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করতে না পারতেন তা হলে ভারতের স্বাধীনতা হয়ত সম্ভব হত না। গান্ধীজীর "ভারত ছাড়" ও "আগষ্ট

আন্দোলন"-এ স্বাধীনতা আসত না, যদি সুভাষচন্দ্রের নায়কত্বে বাইরে থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত-অভিযান না ঘটত।

সুভাষচন্দ্র সেদিন একা সম্যক অনুধাবন করেছিলেন যে আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভের সাথে বাইরের আঘাত যদি যুগপৎ না আসে তা' হলে শাসকের শক্তিকে সহসা খর্ব করা যায় না। তাই তিনি সংগোপনে ভারত ত্যাগ করে জার্মান ও জাপান ঘুরে সিঙ্গাপুরে এসে ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারত অভিমুখে সামরিক অভিযান শুরু করেন। ভারতের মুক্তিআন্দোলনের সার্থকতায় সুভাষচন্দ্রের এই হ'ল সবচেয়ে বড় অবদান।

* * *

লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী-নেতাদের বিচারের প্রতিবাদে সারা ভারতময় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়—তরুণরা বিদ্রোহী হয়, বিদ্রোহ করে ভারতের নৌবাহিনী। ইংরাজরা বুঝতে পারল ভারতের সৈন্যদের উপর ভরসা করে ভারত শাসন করা অসম্ভব।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত ত্যাগে বাধ্য হ'ল ইংরাজ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্থকতার মূলে তাই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও তার সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র।

* * *

দরিদ্র, দুর্বল, পরাধীন ভারতের পক্ষে শক্তিশালী ইংরাজ-সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান ছিল একদিন আকাশ-কুসুম কল্পনা। এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে স্বাধীনতার সংগ্রামকে সফল করেছেন সুভাষচন্দ্র···

সুভাষচন্দ্র জীবিত, কি মৃত সে প্রশ্ন বড় নয়। বড় কথা

স্বাধীনতার আন্দোলনকে সার্থক করবার জন্য যা কিছু করবার দরকার ছিল তা তিনি-ই করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই ভূমিকা হয়ত সম্ভব হত না সুভাষ ছাড়া। এই ভূমিকায় সুভাষকে আমরা দেখব। মনে প্রাণে জানব পরাধীন ভারতের মুক্তিদাতা সুভাষকে।

কারও কারও ধারণা বিদেশী রাষ্ট্রের কারাগারে অথবা আশ্রয়ে আছেন তিনি—আবার কারও ধারণা তিনি ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীরূপে এখনও আশ্রমে আছেন; বিমান দুর্ঘটনায় টোকিও-এর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুর খবর সত্য কিনা তাও বলা যায় না। জীবন-মৃত্যুর রহস্যের অন্তরালে আজ পরাধীন ভারতের মুক্তি বিধায়ক সুভাষচন্দ্র।

জীবন-মৃত্যুর এই রহস্যের ফলে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস আছে,—মৃত্যুদিন নাই। এ এক অপরূপ সত্য—চির অমর নেতাজী সুভাষ:

ব্রিটিশ লেখক হিউটয় (Hugh Toye) তাঁর The Springing Tiger পুস্তকে বলেছেন—

By the example of his magnetic burning zeal, his tenacity and personal force and by the tradition he left of sacrificial patriotism, must be measured the stature of Subhas Chandra Bose. His place in Indian history can not be denied.

অর্থাৎ, চিত্তাকর্ষক জ্বলন্ত অনুপ্রেরণা, সংলগ্নশীলতা ও আত্মশক্তির আদর্শে এবং দেশপ্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগের ভূমিকায় সুভাষ বসুর শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ। ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অনস্বীকার্য।

সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার জ্বলন্ত প্রতীক। গান্ধীজীর কাছে স্বাধীনতা লাভের পথ "অহিংসা"-ই ছিল বড়।

সুভাষচন্দ্র বলতেন, 'ছলে-বলে-কৌশলে ইংরেজ যখন আমাদের পরাধীন করেছে, আমরাও তেমন ছলে-বলে-কৌশলে মুক্তিলাভ করব।'

শাসকের সাথে গান্ধীজী আপোষ করেছেন বহুবার কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছিলেন সর্বপ্রকার আপোষের বিরুদ্ধে। তিনি বলতেন, 'আপোষ-অহিংসায় স্বাধীনতা বিলম্বিত হয়। সুযোগ-সুবিধা এনে তাকে স্বাধীনতার কাজে অবশ্যই লাগাতে হবে।'

ইংরেজের বিপদ স্বাধীনতার অপূর্ব সুযোগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এসেছিল সেই সুযোগ। সুভাষচন্দ্র সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতের মুক্তিও অর্জন করেছেন।

ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় কঠোর ও কঠিন কর্তব্যের ডাক এসেছিল। সে ডাকে ভারতের আর কোন নায়ক সেদিন সাড়া দেন নি—দিয়েছিলেন সুভাষ।

বাল্যকাল থেকে বিদ্রোহী, বিপ্লবী, আত্মজয়ী পুরুষের মনোভাব ছিল সুভাষের মধ্যে। তাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল এই কঠোর ও কঠিন কর্তব্যের কাজ।

পরাধীন ভারতের মুক্তি-সাধকরূপে সুভাষচন্দ্র গণ-মানবের মানসে স্থান পেলেও স্বাধীন ভারতের বর্তমান সরকার সামগ্রিক স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেছেন সুভাষকে। তাঁর জন্মদিবসে সারা ভারতে ছুটি ঘোষিত হয় না—শুধু বাংলা দেশে ঘোষিত

হয়। এটা অন্যায়! সুভাষচন্দ্র শুধু বাংলার নন—সারা ভারতের নায়ক।

স্বাধীন ভারতের সরকার সঙ্কীর্ণ মন দিয়ে যা স্বীকার করতে চান নি, স্বাধীন ভারতের গণ-মানব তা স্বীকার করেছেন।

স্বাধীন ভারতের গণ-মানবের কাছে সত্য হয়ে আছে এবং থাকবে চিরদিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষের অপরূপ ভূমিকা।

চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন গণ-মানবের মানসে বিদ্রোহী, বিপ্লবী, আত্মজয়ী পুরুষ সুভাষচন্দ্র—আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র—পরাধীন ভারতের মুক্তি-বিধায়ক সুভাষচন্দ্র।

—শ্রীবিশ্ব

তোমারি আঘাতে কারার দুয়ার
টুটিল অকস্মাৎ
স্বাধীন ভারত-বক্ষে তোমার নির্ভীক পদপাত।

—সজনীকান্ত

'সুভাষচন্দ্র বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারম্বার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবিভূত হন দেশের অধিনায়ক।

......বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী-সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনায়ককে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।'

—রবীন্দ্রনাথ

"The war had shown that a Nation that did not possess military strength could not hope to preserve its independence."

—Subhas Ch. Bose

যুদ্ধ দেখিয়ে দিল, যে জাতির সামরিক শক্তি নেই সে জাতি কোনদিন স্বাধীনতা রক্ষার আশা করতে পারে না।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

বংশ পরিচিতি

প্রাচীন গঙ্গার খাত। মরা নদীর পাড় দিয়ে আজকাল বাস চলেছে গড়িয়া থেকে বারুইপুরের পথে। স্রোতহীন জলাভূমির ম্যালেরিয়া মহামারীর বীজাণুর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পরিত্যক্ত দুধারে গ্রাম-গ্রামান্তর।

স্বাধীনতার পর আবার প্রাণচঞ্চলতার হচ্ছে আবির্ভাব। দু'ধারে কল-কারখানা, বসতবাটি গড়ে উঠছে—গড়ে উঠছে রামকৃষ্ণ মিশনের নূতন উপনিবেশ নরেন্দ্রপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া। বাস এখানে থামে। চোখে পড়ে একখানা সাইনবোর্ড—দুশ' গজ দূরে বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের পৈত্রিক ভিটা।

গ্রামের নাম কোদালিয়া। এই গ্রামে সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক ভিটে। এই গ্রামের পত্তন করেন মাহিনগরের বসু পরিবারের অধঃস্তন পুরুষ গোপীনাথ বসুর বংশধরগণ।

এই বসু পরিবার দক্ষিণরাঢ়ী। বসুরা কায়স্থবংশ সম্ভূত। দক্ষিণরাঢ়ী বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দশরথ বসু। দশরথ বসুর দুই পুত্র—কৃষ্ণ ও পরম। কৃষ্ণ পশ্চিম বঙ্গে বসবাস করতে থাকেন কিন্তু পরম চলে যান পূর্ববঙ্গে।

কৃষ্ণ বসুর পুত্রের প্রপৌত্রের নাম মুক্তি বসু। তিনি কলকাতার কাছে চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে মাহিনগরে গিয়ে বসবাস করেন। মুক্তি বসুর ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ মহীপতি। তিনি তদানীন্তন নবাবের যুদ্ধ ও অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। কর্ম-

কুশলতার জন্য তিনি নবাবের নিকট থেকে সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি লাভ করেন এবং নিকটস্থ একখানি গ্রাম জায়গীররূপে পান। গ্রামখানির নাম এখন সুবুদ্ধিপুর।

মহীপতির চতুর্থ পুত্রের নাম ঈশান খাঁ। পিতার মত তিনি নবাবের অনুগ্রহ লাভ করেন। ঈশান খাঁর তিন পুত্র। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র গোপীনাথ বসু।

গোপীনাথ বসু তদানীন্তন বাংলার রাজধানী গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৯)-এর অর্থমন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতি ছিলেন। কর্মকুশলতার জন্য তিনি পুরন্দর খাঁ উপাধি লাভ করেন এবং মাহিনগরের সন্নিকটে জায়গীর স্বরূপ একখানি গ্রাম লাভ করেন। এই গ্রাম অধুনা পুরন্দরপুর নামে খ্যাত। পুরন্দরপুরে গোপীনাথ বসুর বর্তমানে খানপুকুর নামক একটি পুষ্করিণী এবং তাঁর বাগান বাটির স্মৃতি বহন করছে মাহিনগর গ্রামের সন্নিকটে মালঞ্চ গ্রামখানি।

গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ) সমাজ সংস্কারক ও পদাবলী রচয়িতা ছিলেন। বল্লালী প্রথানুযায়ী কুলীনের সাথে মৌলিকের বিবাহ চলত না। গোপীনাথ বসুর বিধানে কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া অন্য পুত্র বা কন্যা মৌলিকে বিবাহ করতে সমর্থ হলেন।

তখন গঙ্গা মাহিনগরের তলা দিয়ে প্রবাহিত ছিল। নৌকাযোগে এই পথে গোপীনাথ বসু গৌড়ে যাতায়াত করতেন। গঙ্গা অন্য পথে চলে যাওয়ার এ অঞ্চলে জলনিকাশের পথ বন্ধ হল এবং এ দেশের স্বাস্থ্য, সম্পদ অন্তর্হিত হয়। সে সময় পুরন্দর বসুর বংশধরগণ কোদালিয়া গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

এই কোদালিয়া গ্রাম। এখান থেকে বর্তমান বারুইপুর

রেল ষ্টেশন এলাকার দু' পার পর্যন্ত ছিল একদা সুভাষচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণের লীলাক্ষেত্র।

*   *   *   *

এল ইংরাজ রাজত্ব। ইংরাজী সভ্যতার সম্পর্শে এই সব মরাগ্রামে আবার প্রাণের জোয়ার এল। ম্যালেরিয়া-মহামারী কবলিত অরণ্যে পরিণত রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া অঞ্চলে বাঙালীর নব-সংস্কৃতির সূত্রপাত হ'ল।

প্রাণহীন হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মমতের আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে প্রাদুর্ভূত হলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, সোম প্রকাশ (বাংলায় লিখিত প্রথম সাপ্তাহিক) পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্ণধার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। আবির্ভূত হলেন 'দায়ভাগ' লেখক ভরতচন্দ্র শিরোমণি।

সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারে এই হ'ল এই দেশের অবদান। শিল্পে ও জাতীয় আন্দোলনে এখানকার দান কম নয়। চিত্রকর কালীকুমার চক্রবর্তী এবং সঙ্গীতজ্ঞ অঘোর চক্রবর্তী ও কালী-প্রসন্ন বসু এবং জাতীয় আন্দোলনে হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জি (দেওলি বন্দী শিবিরে দেহত্যাগ করেন) ও এম, এন, রায় এ দেশের মুখোজ্জ্বল করেন।

সুভাষচন্দ্রের পিতামহ হরনাথ বসু। তাঁর চার পুত্র। জ্যেষ্ঠ যদুনাথ সিমলায় ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন এবং সেখানেই বসবাস করতেন। মধ্যম কেদারনাথ কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। তৃতীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন এবং কলেজের প্রিন্সিপাল হন। তিনিও

কলকাতার অধিবাসী হন। কনিষ্ঠ জানকীনাথ সুভাষচন্দ্রের পিতা।

কোদালিয়ায় জানকীনাথের দশ পুরুষের বাস। পুরন্দর বসু থেকে তিনি ত্রয়োদশ পুরুষ এবং দশরথ বসু থেকে তিনি ছাব্বিশ পুরুষ। জানকীনাথ ইংরাজী ১৮৬০ সালে ২৮শে মে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার আলবার্ট স্কুল থেকে তিনি এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং জেনারেল এসেমব্লি'স ইনষ্টিটিউশনে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) উচ্চ শিক্ষায় রত হন। অতঃপর তিনি কটকের র‍্যাভেন শ' কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ওকালতি পাশ করেন। কিছুদিনের জন্য তিনি আলবার্ট কলেজের লেকচারার হন। অবশেষে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কটকে ওকালতি শুরু করেন।

১৯০১ সনে জানকীনাথ কটক মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৫ সনে তিনি সরকারী উকিল এবং পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন। ১৯১২ সনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং রায় বাহাদুর উপাধি পান। সরকারী চাকুরিয়া হলেও তিনি স্বদেশীভাবাপন্ন ছিলেন। শিক্ষা ও সমাজ সেবায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। উড়িষ্যা ও কোদালিয়ায় তাঁর প্রচুর দান ছিল। কোদালিয়ায় তিনি তাঁর পিতার নামে পাঠাগার এবং মাতার নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

হাটখোলার দত্ত পরিবারে জানকীনাথ বিবাহ করেন। দত্ত পরিবারের কাশীনাথ দত্ত বৃটিশ ফার্ম 'জার্ডিন স্কিনার এণ্ড কোং'-এর বড় চাকুরিয়া ছিলেন। বরানগরে তিনি এক বিরাট বাড়ি

নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পুত্র গঙ্গা-নারায়ণ দত্তের কন্যা প্রভাবতী ছিলেন জানকীনাথের সহধর্মিনী এবং সুভাষচন্দ্রের মাতা। ১৮৬৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

কটকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে মতদ্বৈততার জন্য জানকীনাথ ১৯১৭ সালে সরকারী চাকুরি পরিত্যাগ করেন।

সরকারী নিপীড়ননীতির প্রতিবাদে ১৯৩০ সালে জানকীনাথ রায়বাহাদুর উপাধি বর্জন করেন।

জানকীনাথের আটটি পুত্র ও ছয়টি কন্যা।

সুভাষচন্দ্র জানকীনাথের নবম সন্তান। পুত্রদের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ।

জন্ম ও পরিবেশ

কটক—প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। স্বাস্থ্যকর স্থান এবং প্রসিদ্ধ তীর্থ—পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের কাছাকাছি। আজকাল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কটক পৌঁছান যায় কিন্তু সুভাষ-চান্দ্রর পিতা জানকীনাথ যখন কটকে চাকুরী করতেন তখন কটকে যাওয়া এত সহজ ব্যাপার ছিল না। গো-যানে দস্যু-তস্কর অধ্যুষিত পথে অথবা নৌকাযোগে সমুদ্রে তরঙ্গ-তুফানের পথে কটকে যাতায়াত চলত।

জানকীনাথের সংসার ছিল বিরাট। স্বামী, স্ত্রী, পুত্রকন্যা, অতিথি-অভ্যাগত, দাসদাসী, বাবুর্চি, সহিসে সে এক বিরাট পরিবার। শহরের মধ্যস্থলে বাড়িখানা সব সময় জন-সমাগমে গম্‌গম্‌ করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ।

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী তারিখ শনিবার সুভাষচন্দ্র জানকীনাথের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। জানকীনাথ তখনও সরকারী উকিল হন নি। ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি তখন বেশ পসার করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের বৃহৎ পরিবারে জন্ম। বৃহৎ পরিবারে জন্মের ত্রুটি অনেক। বড় বড় সংসারে শিশু ব্যক্তিগত যত্ন যথেষ্ট পায় না। শিশু সুভাষের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

বড় বড় ভাইদের মধ্যে পড়ে শিশু সুভাষচন্দ্র নিজেকে বড় নীচু মনে করতেন। তাঁর সব সময় মনে হত তাঁর বড় ভাইরা যতটুকু কৃতবিদ্যতা লাভ করছেন তিনি হয়ত তার স্বল্পতম মাত্র অংশই লাভ করতে পারবেন। শিশু সুভাষচন্দ্র পিতামাতাকে

খুব ভয়ের চোখে দেখতেন। সৌহার্দ ছিল তাঁর বেশী দাসদাসীদের সাথে।

এই গৃহ-পরিবেশের জন্য শিশুকালে সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বল্পভাষী এবং লজ্জাশীল। ফলে অতি শৈশবেই তিনি অন্তর্মুখী মনোভাবের অধিকারী হন।

বাংলায় প্রথম বৃটিশ শাসন। বৃটিশ শাসকের সহায়ক হলেন আদায়কারী জমিদার, উকিল, আমলা ও বণিক। পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্থলে এঁদের নিয়ে শুরু হ'ল অভিজাত-তান্ত্রিক সমাজ। ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব দেখা দেয় এঁদের মাধ্যমে বাংলার জাতীয় জীবনে। নব নব মত ও পথের সন্ধান বাঙালী দেয় ভারতকে।

সাংস্কৃতিক জাগরণ ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন নিয়ে আসেন প্রথম রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩)।

সে আন্দোলনকে আরও রূপায়িত করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৮—১৯০৫) এবং কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—১৮৮৪)।

প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির সাথে এই নব সংস্কৃতির যে সংঘাত দেখা দেয় তার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হন খাঁটি বাংলার খাঁটি মানুষ বিদ্যাসাগর ও ভূদেব।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের আদর্শ প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির সাথে নব সংস্কৃতির মিশ্রনের ক্ষেত্র রচনায় প্রয়াস পায়—তাই বিদ্যাসাগর চরিত্র পরবর্তী বাংলার সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারের ফলে প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি লোপের যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা বিদ্যাসাগরের পুত-

জীবনের আদর্শে রুদ্ধ হ'ল কিন্তু বাংলায় খ্রীষ্টানধর্মের উত্তরোত্তর প্রসারের ফলে হিন্দুধর্ম লোপের আশঙ্কা দেখা দেয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কামার্থ ত্যাগ ও আদর্শ জীবন যাপনের আহ্বান ও তদীয় শিষ্য বিবেকানন্দের আত্মার উন্নতি ও নরনারায়ণের সেবায় শিক্ষিত বাঙালীর মনকে খৃষ্টান ধর্মের দিক থেকে পুনরায় হিন্দু-ধর্মের প্রতি কেন্দ্রীভূত করে। ফলে ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালীর ধর্মরাজ্যে যে আলোড়ন ঘটে তা থেকে হিন্দুধর্ম আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়।

বালক সুভাষচন্দ্র বাল্যকালে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং সেই অল্প বয়সে নৈতিক জীবন লাভের জন্য গুরুর সন্ধানে তীর্থভ্রমণে বার হন কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি অনুধাবন করলেন—নিছক নৈতিক সাধনা মূল্যহীন, যদি তা মানব, সমাজ ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এ ধরনের আভাষ বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল কিন্তু প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এবং পরে তিলক ও গান্ধীর জীবনে নৈতিক সাধনার সাথে রাজনীতির সম্পর্কের কথা উঠে।

পরবর্তী জীবনে সুভাষচন্দ্র অনুধাবন করেন, রাজনীতির সহিত সম্পর্করহিত নৈতিক সাধনা মূল্যহীন।

এ সম্পর্কে তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী'তে বলেছেন:

···Life is one whole. If we accept an idea, we have to give ourselves wholly to it and to allow it to transform our entire life. A light

brought into a dark room will necessarily illuminate every portion of it.

(Netaji's Autobiography "In Indian Pilgirm")

অর্থাৎ, জীবন অখণ্ড। আমরা যদি কোন আদর্শ গ্রহণ করি, তা হলে আমরা তাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করব এবং সেই আদর্শে আমরা আমাদের সমগ্র জীবনকে গড়ে উঠতে দিব। অন্ধকার ঘরের আলো অংশুই ঘরের প্রতিটি অংশ আলোকিত করবে।

[নেতাজীর আত্মজীবনী 'ভারততীর্থ পথিক']

বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন

১৯০২—১৯১২

প্রটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুল (১৯০২—৮)

র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুল (১৯০৯—১১)

সুভাষচন্দ্রের প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয় মিশনারী বিদ্যালয়ে। ব্যাপটিস্ট-মিশন পরিচালিত প্রটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে সুভাষচন্দ্র যখন ভর্তি হন তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছিলেন হয় ইউরোপীয়ান—না হয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ছাত্ররাও বেশীর ভাগ তাই। ভারতীয় ছাত্র শতকরা মাত্র পনর জন। শিক্ষার মাধ্যম পুরা মাত্রায় ইংরাজী।

মিশনারী বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার ও ভেদনীতি প্রযুক্ত হ'ত। ভারতীয় ছাত্রদের খেলাধূলার চেয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ ছিল বেশী কিন্তু ইংরাজ ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্ররা পড়াশোনার চেয়ে খেলাধূলার দিকে ছিল বেশী আগ্রহশীল। ফলে পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় ছাত্রদের ফল ভাল হত। ইউরোপীয়ান ও অ্যালো ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের যাতে ভারতীয় ছাত্রদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে হয় তজ্জন্য স্কলারশিপ পরীক্ষা ভারতীয় ছাত্রদের দিতে দেওয়া হ'ত না। বিদ্যালয়ের এই বৈষম্যমুলক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে বালক সুভাষচন্দ্রের কষ্ট হয়নি; কারণ তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু সাহেব-ঘেঁষা লোক ছিলেন এবং সাহেবী আদব-কায়দা, চালচলন ও শিক্ষা-দীক্ষায় পটু ছিলেন।

ইংরাজী ১৯০২ সনের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একাদিক্রমে সাত বৎসর সুভাষচন্দ্র মিশনারী স্কুলে ছিলেন। বার বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৯০০ সনের জানুয়ারী মাসে কটকের র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে (এখনকার ক্লাস সেভেন) তিনি ভর্তি হন। নূতন সিলেবাস অনুযায়ী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষার সাথে মাতৃভাষা শিক্ষারও দরকার হওয়ায় সুভাষচন্দ্রকে বিদ্যালয় পরিবর্তন করতে হয়।

মাতৃভাষায় শিক্ষা না থাকায় সুভাষচন্দ্র এই বিদ্যালয়ে এসে প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধায় পড়লেন। ভাল বাংলা না জানার জন্য তাঁকে শিক্ষক ও ছাত্রদের কটু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত প্রায়ই। অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার জন্য তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রমহলে বেশ সুনাম হয়। এই সুনামের জন্যই তিনি নিজের মধ্যে পেলেন আত্মপ্রত্যয়ের সন্ধান। মিশনারী বিদ্যালয়ে বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য তিনি যা কোনদিন পান নি।

এই দৃঢ় বিশ্বাস সম্বল করে সুভাষচন্দ্র ঘরে মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলে সেবারকার বাৎসরিক পরীক্ষায় সুভাষচন্দ্র বাংলায় সতীর্থের চেয়ে বেশী নম্বর পান।

এতে আমরা শুধু তাঁর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাই তা নয়, তাঁর বিপুল মেধারও পরিচয় পাই।

র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে এসে সুভাষচন্দ্রের দুটি জিনিষ লাভ হ'ল, যা তাঁর মিশনারী স্কুলে কোনদিন জোটেনি। তিনি র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে পেলেন অকৃত্রিম এক বন্ধুগোষ্ঠী আর এক চরিত্রবান আদর্শ পুরুষ প্রধানশিক্ষক।

প্রধানশিক্ষক বেণীমাধব দাশের নৈতিক জীবন, আদর্শ-চরিত্র কিশোর সুভাষের মনে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। এঁর সামীপ্যে

তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'ল এক নূতন পৃথিবী—তুচ্ছ অর্থ, অসার গৃহসংসারের চেয়ে এক উচ্চতর পৃথিবী।

পুরা দু' বছর এক অভিনব আদর্শের প্রেরণার মধ্যে কিশোর সুভাষের দিন অতিবাহিত হয়। যখন তিনি সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র তখন সহসা একদিন প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাশ বিদ্যালয়ের কার্যভার থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন চোদ্দ বৎসর।

আদর্শ পুরুষের সাথে অকস্মাৎ এই বিচ্ছেদের ফলে এই অল্পবয়সে সুভাষচন্দ্রের মন উচ্চতর জীবন ও আদর্শের জন্য হয়ে উঠল আরও ব্যাকুল।

মানুষ যা চায় তাই পাওয়ারই তার সুযোগ ঘটে। উচ্চতর জীবন ও আদর্শের জন্য ব্যাকুলিত সুভাষচন্দ্রের জীবনে তাঁর সাধনাসিদ্ধির উপায় প্রাপ্তির এক সুযোগ এল অকস্মাৎ। কটকে পিতার বাসার পাশে একটা বাড়িতে হঠাৎ তাঁর এক আত্মীয় এসে উঠলেন। ভদ্রলোকটি কটক শহরে নবাগত। এঁর বাসায় সুভাষচন্দ্রের যাতায়াত শুরু হ'ল।

ভদ্রলোক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। এখানে সুভাষচন্দ্র পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা সব বই, পড়লেন তাঁর রচনা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী।

বিবেকানন্দের লেখা পড়ে কিশোর সেদিন বুঝলেন—আত্মার উন্নতি আর নারায়ণের সেবা মানবের পরম ধর্ম।

বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ। বিবেকানন্দের বিদ্যাবত্তা অতুলনীয় কিন্তু রামকৃষ্ণ নিরক্ষর। নিরক্ষর রামকৃষ্ণের কথা হ'ল—কাম-অর্থ ত্যাগ ও আদর্শ জীবন যাপনে ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে। আর তাঁর শিষ্য বিদ্বান বিবেকানন্দের কথা হল—আত্মার উন্নতি ও

নারায়ণের সেবায় ঈশ্বর প্রাপ্তি। বিবেকানন্দের রচনা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী পড়ে বিবেকানন্দের আদর্শ জানা যায়।

রামকৃষ্ণের শিক্ষা কথোপকথন মারফৎ শিক্ষা। তাঁর শিক্ষা শিষ্যগণ কর্তৃক পুস্তকরূপে প্রকাশিত। এই সব পুস্তক পড়ে সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণের শিক্ষা অনুধাবন করলেন। সুভাষচন্দ্রের সাহচর্যে তাঁর বন্ধুগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত হয়ে পড়লেন।

রামকৃষ্ণের শিক্ষা হ'ল আত্মত্যাগ, চিত্তশুদ্ধি আর তা উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন নীচ ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাথে অবিরাম সংগ্রাম।

বিবেকানন্দের শিক্ষা হ'ল আত্মার মুক্তি ও নর-নারায়ণের সেবা। আর তা উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন প্রচলিত গৃহ ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভক্ত সুভাষের সামনে দাঁড়াল দুটি কর্তব্য-

প্রথমত—নীচ ইন্দ্রিয় বৃত্তির সাথে অবিরাম সংগ্রাম—যার জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য, ধ্যান ও যোগ সাধনায় মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা;

দ্বিতীয়তঃ—প্রচলিত গৃহ ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—যার জন্য প্রয়োজন দেশের কাজ ও সেবাব্রত।

ব্রহ্মচর্য ও যোগসাধনা অর্থাৎ মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং হঠযোগ অর্থাৎ দৈহিক চর্চা।

সুভাষচন্দ্র এই সম্বন্ধে প্রচলিত পুস্তকাদি সংগ্রহ করে সেসব পড়া শুরু করলেন। পুস্তকের নির্দেশানুসারে তিনি যোগসাধনায় ব্রতী হলেন। লোকচক্ষু ও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনার হাত এড়াবার জন্য সূর্যাস্তের পর তিনি সন্ধ্যার অন্ধকারে যোগাভ্যাস শুরু করলেন। মনসংযোগ অভ্যাস করবার জন্য কাল বৃত্তের

কেন্দ্রের মাঝখানে শ্বেত বিন্দুতে অথবা নীলাকাশের পানে তিনি অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকতেন। আত্মনিপীড়নের জন্ম তি!ন সাধারণত নিরামিষ খাদ্য, প্রাতরুত্থান এবং শীত-গ্রীষ্মে শরীর নির্বিকার রাখা অভ্যাস করতে লাগলেন।

যোগসাধনায় রামকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষগণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। সেরূপ কোন শক্তির লক্ষণ না দেখে বালক সুভাষ বুঝলেন যোগ্য পরিচালনার অভাবে তাঁর যোগ-সাধনা সফল হচ্ছে না।

যোগ-সাধনায় নির্দেশনালাভের জন্য তিনি গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। একজন সাধুর সন্ধান মিলল। তিনি তাঁকে মাছ, মাংস ত্যাগ, মন্ত্রজপ এবং প্রত্যূষে পিতা-মাতাকে প্রণামের ব্যবস্থা দিলেন।

কিছুদিন এভাবে চলে কোন ফল না হওয়ায় তিনি বিবেকানন্দের আদর্শানুয়ায়ী গ্রাম-সেবার কাজে রত হলেন।

সুভাষচন্দ্রের মতি-গতি তাঁর পিতামাতার মনঃপুত হয় না। তাঁদের শাসন ও সংশোধনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়; কারণ তাঁরা কিশোর সুভাষের আদর্শ অনুধাবন করতে সমর্থ হন না। পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন সুভাষচন্দ্রের প্রকৃতি। একদিকে জীবনের আদর্শ, অন্যদিকে পিতামাতার বিরূপতা—তিক্ত মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখে সেদিন কিশোর সুভাষ।

অথচ যে পরিবারের মানুষ সুভার্ষ সে পরিবার তখনকার দিনে কটকের এক অভিজাত পরিবার। ইংরাজ-ঘেঁষা এ পরিবার ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ……

যে অঞ্চলটিতে এই অভিজাত বসু পরিবারের বাস ছিল তা ছিল মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। এই বসু পরিবারের গৃহে চাকর, সহিস,—এমন কি পাচক পর্য্যন্ত ছিল মুসলমান। এ বসু

পরিবারের সাহেবীপনা মাত্র—প্রগতিশীলতা নয়। তাই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর এক হিন্দু সহপাঠীর গৃহে সুভাষের একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ হ'লে সুভাষের মাতাপিতা এ নিমন্ত্রণ রক্ষায় অমত জানান। তখন সুভাষের চোখের সামনে প্রতিভাত হ'ল—আভিজাত্যের অন্তরালে অহমিকা আছে, প্রগতিশীলতা নাই। সেদিন পিতামাতার অন্যায় মত মানতে পারলেন না সুভাষ—তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বন্ধুর গৃহে সেদিন তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন। বিবেকানন্দ-ভক্ত সুভাষের বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিংগ সেই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গেছে সেদিন বাংলার বুকে। অরবিন্দ-বারীন্দ্রের বৈপ্লবিক আন্দোলনের জের চলেছে তখনও বাংলায়। স্বাদেশিকতার সে ঢেউ-এর এতটুকু পৌঁছায়নি এই বাঙালী পরিবারে। শুধু সেই পরিবারের সন্তান কিশোর সুভাষ খবরের কাগজ থেকে বিপ্লবীদের ছবি কেটে পড়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন কিন্তু বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে দেখতেন তিনি—তাঁর সে ছবি অপসারিত।

* * *

১৯১৩ সালের মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র ষোল বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন।

তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার জন্য তিনি কলকাতায় প্রেরিত হলেন।

কলেজীয় শিক্ষাজীবনে প্রবেশ ঃ

প্রেসিডেন্সি কলেজ ঃ ১৯১৩-১৪

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় কলেজ-জীবনে শিক্ষাজীবন শুরু হ'ল কিশোর সুভাষের। নব নব আদর্শবাদের পরিবেশে সুভাষের জীবনে নূতন অধ্যায়ের শুরু হ'ল।

কিশোর বয়সে মানুষ মাত্রেই স্থির করেন তাঁর ভবিষ্যত জীবনের আদর্শ। কলেজ জীবনে প্রবেশ লাভের আগেই কিশোর সুভাষের জীবনধারা স্থির হয়েছিল। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ অনুসরণ করাই হ'ল সুভাষচন্দ্রের কাম্য।

প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যেই ভোগ-লালসার সৃষ্টি। প্রবৃত্তি ও আবেগ-চালিত জীবনই মানবজীবনের মানসিক পটভূমি। ভোগলালসার বিলুপ্তির জন্য এই পটভূমির পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এরূপ পরিবর্তনের যোগ্য পরম সাধক রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ নিজের জীবনে দেখিয়েছেন যৌন-লালসা ত্যাগ মানবজীবনে সম্ভব। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণের মতে যৌনক্ষুধার হাত থেকে সম্যক মুক্তি ছাড়া প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভ অসম্ভব।

কলেজ-জীবনে যখন সুভাষচন্দ্র প্রবেশ লাভ করলেন তখন ছিলেন তিনি রামকৃষ্ণের মতেরই অনুবর্তী। কিশোর সুভাষ সেই সামান্য বয়সেই অনুধাবন করলেন যৌনলালসার বন্ধন থেকে মুক্তি আধ্যাত্মিকতা লাভের প্রকৃত সোপান এবং আধ্যাত্মিক উদ্গতি ছাড়া মানবজীবন মূল্যহীন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে তিনি চার রকমের ছাত্র দেখতে পেলেন। এক দল বই-এর পোকা—পুরু চশমা চোখে রাতদিন

তাঁরা বই নিয়ে পড়ে থাকেন। আর একদল সৌখীন পোশাকী ধনী ও রাজপরিবারের সন্তান। তৃতীয় দল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত। আর চতুর্থ দল গুপ্ত বৈপ্লবিক সংস্থার সভ্য। সুভাষচন্দ্র তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত। কাজে কাজেই তিনি তৃতীয় দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তরা গুপ্ত-বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তখনকার দিনে গুপ্ত-বৈপ্লবিক সংস্থা ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং তজ্জন্য সুভাষ প্রমুখ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তগণ ছাত্রসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না। সভ্য সংগ্রহ ব্যাপারে এই দুই দলে সংঘর্ষও হত মাঝে মাঝে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তদের সন্দেহের চোখে দেখতেন গোয়েন্দা বিভাগ।

১৯১৩ সনের শীতকালে সুভাষ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তগণ সহ শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে এক শিবির স্থাপনা করেন এবং গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর বেশে জীবন যাপন করতে থাকেন। সন্দিগ্ধ গোয়েন্দা বিভাগ তাঁদের নাম-ধাম নিয়ে চলে যান।

সাধারণ বাঙালী তখন শ্রীঅরবিন্দের নামে চঞ্চল। মোটা বেতনের চাকরি ত্যাগ করে তিনি রাজনীতিতে নামেন। কংগ্রেসে তিনি বামপন্থী চিন্তাধারার নায়করূপে অবতীর্ণ হন এবং যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ছাড়া অন্য কথা নেতারা বলতে পারতেন না তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা প্রচার করেন। চরমপন্থী বাল গঙ্গাধরের সাথে শ্রীঅরবিন্দের নিকট-সম্পর্ক থাকায় তিনি সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং গুপ্ত-বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতা বারীন ঘোষ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হওয়ায় তিনি তরুণদের নিকট ছিলেন বিশেষ সম্মানের পাত্র।

রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয় ছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবনে। তজ্জন্য তাঁকে নিয়ে প্রচলিত ছিল নানা রকম প্রবাদ। দৈহিক সাধ্যের যাহা আয়ত্তের বাইরে সে ক্ষেত্রে মানুষ আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক অঘটনে বিশ্বাসী হয়। কলেজ-জীবনে সুভাষচন্দ্র শুনেছিলেন—বার বৎসর যোগ-সাধনায় রত হবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে আছেন এবং বার বছর পর ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সক্রিয় হবেন। আবার সুভাষ একদিন শুনলেন—কম্বল স্কন্ধে সন্ন্যাসীর দল ফোর্টে প্রবেশ করবেন, গোরা সৈন্যরা হবে অথর্ব এবং রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হবে ভারতের জনসাধারণ। এই সব কথা শুনতে এবং বিশ্বাস করতে কিশোর সুভাষের ভালই লাগত।

শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে এসব জনরব কিশোর সুভাষের মনকে কিন্তু আকৃষ্ট করতে পারত না। তবে তাঁর রচনা ও পত্রাবলী পাঠে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। শোনা যায়, শ্রীঅরবিন্দ অর্ধ-সমাধিমগ্ন অবস্থায় থাকতেন এবং তাঁর লেখনী নিজে নিজেই লিখে যেত 'মানিক' নামধারী নিজের মনের কথোপকথন। শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আর্য' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের রচনা পড়ে সুভাষের বিশ্বাস জন্মে—আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছাড়া দেশের কাজ সফল হয় না।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে শ্রীঅরবিন্দের সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কলকাতায় টাউন হলে যে সভা হয় তাতে সুরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখতে পান সুভাষচন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা জোরালো হ'লেও তাতে গভীরতর আবেগের অভাব ছিল। যা ছিল না শ্রীঅরবিন্দের ভাষণে।

রাজনীতি তখনও সুভাষের মনকে আকৃষ্ট করে নি। ধর্মগুরু ও ধর্মসংস্থার দিকে ছিল তাঁর মন। বিবেকানন্দের আদর্শ—আত্মার উন্নতি ও নর-নারায়ণের সেবা তাঁর কিশোর মনে দিয়েছিল দোলা।

সেবা-কার্যের জন্য তিনি দক্ষিণ কলকাতার অনাথভাণ্ডারে যোগদান করেন এবং প্রতি রবিবার অন্যান্য কর্মীদের সাথে দ্বারে দ্বারে অর্থ ও চাউল সংগ্রহ করতেন। আত্মার উন্নতির জন্য প্রকৃত গুরুর সন্ধানে তখনও তিনি উদ্‌গ্রীব।

তীর্থ পরিক্রমা

[গ্রীষ্মাবকাশ—১৯১৪]

কলকাতা থেকে ষাট মাইল দূরে একটি নদীর কিনারায় মফঃস্বলের একটি শহর।

নদী তীরে পাঞ্জাবী এক তরুণ সাধু কঠোর সন্ন্যাসধর্ম পালন করতেন। জাগতিক ভোগ-লালসা তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন। শীত, গ্রীষ্ম তাঁর কাছে সমান। মানসিক পবিত্রতা ও মিষ্ট ব্যবহারে তিনি অনেকেরই চিত্ত জয় করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ছুটি পেলেই এখানে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

মধ্যাহ্নে মাথার উপর সূর্যের প্রখর তাপ। চারি পাশে পাঁচটি জ্বলন্ত ধুনির তপ্ত অগ্নিশিখা। মাঝখানে বসে পাঞ্জাবী তরুণ-তাপস ধ্যানমগ্ন। শারীরিক কষ্ট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সামান্য আহারে ও বস্ত্রে তিনি তুষ্ট।

এই সাধুই কিশোর সুভাষের চিত্ত জয় করেছিলেন কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত বলে তিনি তাঁকে গুরুত্বে বরণ করতে কুণ্ঠিত হলেন।

পঞ্চনদ-বাসী এই তরুণ তাপসের সংস্পর্শে এসে কিশোর সুভাষের মনে প্রকৃত গুরুলাভের বাসনা বলবৎ হল। গুরুর সন্ধানে এক বন্ধুর সাথে সুভাষ ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মবকাশে তীর্থ পরিক্রমায় বার হলেন।

দু' মাস কাল সুভাষচন্দ্র তীর্থে তীর্থে ঘুরলেন—লছমনঝোলা, হৃষিকেশ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া। তীর্থ পরিক্রমাকালে তিনি সাধু-সন্দর্শন, আশ্রম-পরিদর্শন এবং শিক্ষায় মন

পরিদর্শন করলেন। উত্তর-ভারতের হিন্দু-সমাজের প্রাচীন-পন্থীদের অশিক্ষা, কুসংস্কার, ছুঁৎমার্গ ও জাতিভেদের প্রচুর তিক্তকর দৃষ্টান্ত দর্শনে ব্যথিত হলেন কিশোর সুভাষ।

প্রকৃত গুরুর সন্ধান তিনি পেলেন না। হতাশ হয়ে ফিরলেন তিনি গৃহে।

তীর্থ পরিক্রমায় গুরু সন্ধানের কঠোর শ্রমের ফলে সুভাষচন্দ্র টাইফয়েড্ রোগে শয্যাগ্রহণ করলেন। রোগশয্যায় সংবাদ পেলেন, ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র তখন সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্মেষ

প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে গুপ্ত-বৈপ্লবিক সংস্থার সভ্যগণ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রচারে তৎপর হয়ে উঠলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তগণ রাজনীতি সম্পর্কে তখনও নির্বিকার। সুভাষচন্দ্র রাজনীতির ব্যাপারে আর নির্বিকার থাকতে পারলেন না। তার কারণ দুটি—প্রথমতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর দ্বিতীয়তঃ ট্রেনে-ট্রামে-রাজপথে ভারতীয়দের প্রতি গোরাদের অহেতুক স্বেচ্ছাপ্রাণোদিত অপমান।

ট্রেনে অথবা ট্রামে সামনের আসনে যদি ভারতীয়রা বসতেন তা হলে গোরারা জুতাসুদ্ধ পা এমনভাবে সেই আসনে তুলে বসতেন যেন জুতা ভারতীয়দের গায়ে লাগে। ট্রেনে উচ্চশ্রেণীর কামরা প্রায়ই সাহেবরা দখল করে বসতেন—ফলে ভারতীয়রা টিকেট কেটে উচ্চশ্রেণীর কামরায় বসতে পারতেন না। রাজপথে ভারতীয়রা যদি রাস্তা ছেড়ে সরে না দাঁড়াতেন তা হলে সাহেবদের হাতে ঘুষি অথবা কানমলা খেতেন। নরীহ ভারতীয়রা নীরবে অপমান সহ্য করতেন কিন্তু আত্মসম্ভ্রম সম্বন্ধে সজাগ ভারতীয়রা অপমান সহ্য করতেন না। তাই ট্রেনে-ট্রামে-রাজপথে সাদা-কালোয় প্রায়ই কথা কাটাকাটি বাঁধত এবং এই কথাকাটাকাটি শেষকালে হাতাহাতি মারামারিতে পরিণত হত।

ঘুষির বদলে ঘুষির নীতি যে সব ভারতীয়রা প্রয়োগ করতেন তাঁদের সাহেবরা সমীহ করে চলতেন। ফলে সাধারণ মানুষরা বুঝলেন সাহেবরা শক্তের ভক্ত। প্রধানতঃ এই কারণে বাংলার

শহরে, পল্লীতে ব্যায়ামাগার, লাঠিখেলা ও ছোরা খেলার কেন্দ্র এবং গুপ্তসমিতি তৈরীর হিড়িক পড়ে যায়।

মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্র অনুধাবন করলেন— ভারতকে যদি আধুনিক সভ্যদেশে পরিণত করতে হয় তা হলে অহিংসার দোহাই-এ সামরিক সমস্যা এড়ানো কোন মতেই চলতে পারে না। দেশরক্ষার ভার বৃটিশের হাতে দিয়ে দেশশাসনের ভার নিজেদের হাতে নেওয়া অর্থাৎ স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনে দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হতে পারে না।

কিশোর সুভাষ আরও অনুধাবন করলেন, যাঁরা ভারতের মুক্তি চান তাঁদের শুধু বে-সামরিক শাসনভার গ্রহণ করবার যোগ্য হলেই চলবে না, পরন্তু সামরিক শাসনভার গ্রহণ করবার যোগ্যতা ও তাঁদের অর্জন করতে হবেই। সামরিক বল না থাকলে কোন দেশই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না।

ভারতের কোন নেতাই সামরিক শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ হন নি। তার জন্য স্বাধীন হয়েও ভারতকে আজ নানা দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র অতি অল্পবয়সে সামরিক শক্তির মূল্য অনুধাবন করেন এবং সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য অগ্রসর হন।

আরোগ্য লাভের পর সুভাষচন্দ্র পুনরায় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলিত হলেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর মধ্যে আসছিল একটা বিরাট পরিবর্তন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তদলের বন্ধুগণ তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ধর্মভাবের ঊর্ধ্বে রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্মেষ হচ্ছে ধীরে ধীরে।

শুধু তাই নয়…

ঘটনাও তাঁকে নিয়ে চলেছে রাজনৈতিক মার্গের দিকে।

সে ঘটনা অতিবিশ্রুত ঘটনা। প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহেব অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের সহিত তাঁর গোলযোগ। সেই ঘটনার কথা আমরা বলব পরবর্তী অধ্যায়ে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কার

[১৯১৬]

বিবেকানন্দের আদর্শ—আত্মোন্নতি ও নরনারায়ণ সেবার আদর্শে পড়ে সুভাষচন্দ্রের দু বছর কলেজের পড়া তেমন ভাল হ'ল না। ফলে ১৯১৫ সালে আই. এ. পরীক্ষায় তিনি শুধুমাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন, কোন স্থান অধিকার করতে সমর্থ হলেন না। অনুতাপ ও দুঃখ দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি বি. এ. পরীক্ষার ফল ভাল করবার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

দর্শনশাস্ত্রের দিকে তাঁর বাল্যকাল থেকে ঝোঁক ছিল। তিনি ফিলোজফিতে (দর্শন শাস্ত্র) অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়তে শুরু করলেন। বি. এ. পড়তে গিয়ে তাঁর দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে এতদিনকার যে ধারণা ছিল তা বদলে গেল। বাল্যকালে তাঁর ধারণা ছিল —দর্শনশাস্ত্র পাঠে জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কীয় মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হবে তাঁর কিন্তু তার বদলে তিনি পেলেন বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা ও সমালোচনা মুলক মনোভাব।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র পূর্ব প্রচলিত মত খণ্ডন করতে মানুষকে শিক্ষা দেয় এবং কোন কিছুকে অকাট্য সত্য বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে মানুষকে নিষেধ করে। যখন তাঁর দলের বন্ধুগণ বেদান্তের সত্যকে শিরোধার্য করে বসে থাকলেন তখন তিনি বেদান্তের সত্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন এবং বস্তুতান্ত্রিকতার পক্ষে প্রবন্ধ রচনায় রত হলেন। ফলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তদের সাথে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা বেশ প্রকট হয়ে পড়ল।

নিছক ধর্মচর্চা থেকে সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে এসে পড়ছেন সামরিক শক্তি, পূর্ণ স্বাধীনতা ও ভোগবাদের পক্ষে।

*　　　*　　　*

রাজনৈতিক মার্গের দিকে সুভাষকে নিয়ে চলেছে ঘটনা—সেই অতিবিশ্রুত ঘটনা: প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহেব অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের সহিত তাঁর গোলযোগের ঘটনা। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাস। জনৈক সাহেব অধ্যাপকের পাঠদানকক্ষের সামনের বারান্দায় সুভাষচন্দ্রের কয়েকজন সতীর্থ পায়চারি করছিলেন, এমন সময় অধ্যাপকমহাশয় বিরক্তিবোধ করে কক্ষ থেকে বার হয়ে আসেন এবং সামনের কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। সুভাষচন্দ্র তখন কলেজ পাঠাগারে পাঠরত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর শ্রেণীর প্রতিনিধি। তিনি অধ্যক্ষের নিকট দাবী জানালেন—সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক অভদ্রজনোচিত ব্যবহারের জন্য ছাত্রদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অধ্যক্ষ অধ্যাপকের কার্যে নিন্দনীয় কিছু মনে করেন না। ছাত্রদের অভিযোগ তিনি উপেক্ষা করলেন।

পরদিন কলেজে হ'ল ধর্মঘট। মৌলভী সাহেব মুসলমান ছাত্রদের ধর্মঘট থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। জনপ্রিয় অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডঃ ডি. এন. মল্লিকের আবেদন সত্ত্বেও ছাত্রগণ ধর্মঘটে রত হলেন। দ্বিতীয় দিনেও ধর্মঘট চলল। অধ্যক্ষের উপরোধে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক উভয়পক্ষের সম্মানজনক সর্তে ছাত্র-প্রতিনিধিদের কাছে মীমাংসায় উপনীত হলেন।

ধর্মঘটের সময় অধ্যক্ষ মহাশয় অনুপস্থিত ছাত্রদের জরিমানা ধার্য করেন। দরিদ্র ছাত্র ছাড়া সকলকে জরিমানা দিতে বাধ্য

করা হল। ছাত্রদের উষ্মা কমল না। তার উপর মাস খানেকের পর সেই অধ্যাপকই পুনরায় প্রথমবর্ষের একটি ছাত্রের উপর জরিমানা আদায়ের জন্য বলপ্রয়োগ করেন।

আবেদন নিবেদনে কোন ফল হয় না বলে একজন ছাত্র অধ্যাপককে পিছন দিক থেকে একটি থাপ্পড় মারেন। সংবাদটি অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হল। বাংলা সরকারের আদেশে কলেজ বন্ধ হ'ল এবং অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হ'ল। অধ্যক্ষের এক্তিয়ার এড়িয়ে গাওতায় সরাসরি বাংলা সরকারের এরূপ আদেশ জারি হওয়ায় অধ্যক্ষ ও শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয় এবং শিক্ষামন্ত্রীর আদেশে অধ্যক্ষ সাময়িক ভাবে কর্মচ্যুত হন। কর্মচ্যুতি বলবৎ হওয়ার আগেই অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্র গোলযোগের অন্যতম নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে অন্য কোন কলেজে পড়বার অনুমতি দিলেন না।

মহাযুদ্ধের হিড়িক—কলকাতায় প্রচুর গ্রেফ্তার চলছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের বহিষ্কৃত কয়েকজন ছাত্রনেতাও গ্রেফ্তার হলেন। সুভাষচন্দ্রের অভিভাবকগণ তাঁকে কটকের বাসায় প্রেরণ করলেন।

রাত্রিতে ট্রেনের বাঙ্কে শুয়ে পড়ে সুভাষচন্দ্র অনুধাবন করলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময়। কৃতকার্যের জন্য সুভাষচন্দ্র অনুতপ্ত হন না বরং আত্মসম্মানের জন্য, মহান কার্যের জন্য তাঁর যে এই ত্যাগ এর জন্য সুভাষ লাভ করলেন আত্মপ্রসাদ। এ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছেন:

I had stood up with courage and compos-

ure in a crisis and fulfilled my duty. I had developed self-confidence as well as initiative which was to stand me in good stead in future. I had a foretaste of leadership—though in a very restricted sphere--and of the martyrdom that it involves.

[Netaji's Autobiography "An Indian Pilgrim."]

অর্থাৎ, সেদিন সে সঙ্কটে দৃঢ় মনোবল ও সৎসাহসের সাথে আমি আমার কর্তব্য পালন করলাম। আমি অর্জন করলাম আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও কর্মপ্রেরণা যা সুপ্রতিষ্ঠিত করল আমাকে পরবর্তী জীবনে। অতিশয় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমি লাভ করলাম সেদিন নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের জন্য ত্যাগের অপূর্ব আস্বাদ।

[নেতাজীর আত্মজীবনী —"ভারততীর্থ পথিক"]

স্কটিশচার্চ কলেজ

[১৯১৭—১৯১৯]

ব্রিটিশ শাসনে উড়িষ্যার মানুষ ছিল মূর্খ, দরিদ্র ও শিক্ষাহীন। পল্লীতে পল্লীতে কলেরা মহামারী লেগেই থাকত। বিনা চিকিৎসায় মানুষ প্রাণ হারাত।

কলেজের পড়াশোনা থেকে সাময়িক অব্যাহতি পেয়ে সুভাষচন্দ্র বন্ধু-বান্ধব সহ উড়িষ্যার পীড়িত লোকদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও সেবাকার্য শুরু করলেন। তা ছাড়া, সময় ও সুযোগ পেলে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে ও তীর্থধামে বেড়াতে বার হতেন। গৃহে বন্দী হয়ে পাঠাভ্যাস এবং যোগসাধনায় আর তাঁর মন বসত না।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মত পরিবর্তন করতে রাজী হলেন। কোন কলেজ যদি তাঁকে ভর্তি করে নিতে সম্মত হয় তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় বাধা দিবেন না। বঙ্গবাসী কলেজ সুভাষচন্দ্রকে ভর্তি করে নিতে সম্মত হ'ল কিন্তু সে কলেজে ফিলজফিতে অনার্স না থাকায় সুভাষচন্দ্র সে চেষ্টা করলেন না।

স্কটিশচার্চ কলেজে ফিলজফিতে অনার্স ছিল। সুভাষচন্দ্র ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ আর কুহাটের সাথে দেখা করলেন। তিনি বললেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের যদি আপত্তি না থাকে তা হলে তিনি তাঁকে ভর্তি করে নিতে পারেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন নূতন অধ্যক্ষ। তিনি আপত্তি না তোলায় সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজে প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হলেন।

দু'বছর সুভাষচন্দ্রের নষ্ট হ'ল। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজে তৃতীয় বর্ষ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। তাঁর পূর্বেকার সতীর্থগণ তখন বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়ছেন। দু' বছর পিছনে পড়ে থাকলেন সুভাষচন্দ্র।

ভারতীয় রক্ষী-বাহিনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইউনিট স্থাপনের জন্য সরকার তখন তৎপর। বাঙালী তরুণরা যাতে সামরিক শিক্ষা পান তজ্জন্য সেই সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গত ডাঃ সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এই বাহিনীতে যোগদান করলেন।

সৈনিকত্ব শিক্ষায় সুভাষচন্দ্রের একটি বছর গত হ'ল। তৃতীয় বর্ষ শ্রেণীতে তাঁর তেমন পড়াশোনা হ'ল না। চতুর্থ বর্ষ শ্রেণীতে তিনি পড়াশোনায় মনোযোগী হলেন। ১৯১৯ সালে তিনি ফিলজফিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন।

বি. এ. পাশের পর সুভাষচন্দ্র এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিতে এম. এ. পড়তে শুরু করেন।

জানকীনাথ বসু কলকাতায় এলেন ইতিমধ্যে। একদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র বসুর সহিত পরামর্শে রত তখন তিনি কাছে ডাকলেন সুভাষকে। তিনি আই. সি. এস. পড়বার জন্য সুভাষকে বিলাত পাঠাতে মনস্থ করলেন।

সুভাষচন্দ্রের কোন অজুহাত টিকল না। ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজে তিনি বিলাত যাত্রা করলেন। সুভাষচন্দ্র তখন বাইশ বছর বয়সের তরুণ যুবক।

*　　*　　*

সাগরপারে শিক্ষাজীবন
[১৯১৯—১৯২১]

"We have got to make a nation and a nation can be made only by the uncompromising idealism of Hampden and Cromwell ......I have come to believe that it is time for us to wash our hands clean of any connection with the British Government. Every Government servant whether he be a petty chaprasi or a provincial Government only helps to contribute to the stability of the British Government in India. The best way to end a Government is to withdraw from it. I say this not because that was Tolstoy's doctrine nor because Gandhi preaches it—but because I have come to believe in it."

[Extract from a letter of Subhas written to his second elder brother Sarat Bose on 28th April 1921 from Cambridge after he resigned from I. C. S.]

"জাতি গঠন আমাদের করণীয় কাজ। হাম্‌পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষ-বিরোধী আদর্শেই শুধু জাতি গঠন সম্ভব। আমার এখন বিশ্বাস যে ইংরাজ সরকারের সাথে সম্পর্ক ছেদ

করবার সময় উপস্থিত। চাপরাসি হ'ক আর প্রাদেশিক শাসনকর্তা হ'ক....প্রতিটি সরকারি চাকুরিয়া ভারতে বৃটিশ শাসন স্থায়ী করতে সাহায্য করছেন। সরকারের পতন ঘটাতে হলে সরকারের সাথে অসহযোগ আন্দোলন সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহা টলষ্টয়ের নীতি বা গান্ধীর বাণী বলে বলছি তা নয়—আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি।”

[আই, সি, এস থেকে পদত্যাগের পর ১৯২১ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে মেজদা শরৎবসুকে লিখিত সুভাষের পত্রাংশ]

ক্যামব্রিজে ট্রাইপস্ ও আই. সি. এস্ পরীক্ষা

[১৯১৯—১৯২১]

"সিটি অফ্ ক্যালকাট." নামক জাহাজে সুভাষচন্দ্র বিলাত যাত্রা করলেন। মন্থরগতি সমুদ্রপোত—টিলবারি বন্দরে পৌঁছাতে লাগে একটি মাস।

বিলাতে তখন খনি-ধর্মঘট চল্‌ছিল। কয়লার অভাবে জাহাজ আটক পড়ে সুয়েজ খালে। ফলে বন্দরে পৌঁছাতে দেরী হ'ল আরও এক সপ্তাহ। অক্টোবরের ২৫ তারিখে সুভাষচন্দ্র পৌঁছলেন বিলাতে।

বিলাতে পৌঁছে পরদিন সকালে তিনি ক্রমওয়েল রোডে গেলেন এবং ভারতীয় ছাত্রদের উপদেষ্টার আপিসে এলেন। ভর্তির ব্যাপারে তিনি সুভাষকে কোন সাহায্য করতে পারলেন না। এখানে দৈবাৎ ক্যামব্রিজের একজন ভারতীয় ছাত্রের সহিত সুভাষের সাক্ষাৎ হয়। তাঁর নির্দেশে সুভাষ পরদিন ক্যামব্রিজে উপনীত হলেন। পূর্ব পরিচিত উড়িষ্যার কয়েকজন ছাত্রের চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র এখানে মিঃ রেডাওয়ের সহিত পরিচিত হলেন এবং তাঁরই চেষ্টায় ক্যামব্রিজে ভর্তি হলেন।

নভেম্বর মাস থেকে সুভাষের পড়াশোনা আরম্ভ হল। প্রত্যহ তাঁকে অনেকগুলো লেকচারে যোগ দিতে হ'ত। তন্মধ্যে কতকগুলো Mental and Moral Sciences Tripos এর জন্য আর কতকগুলো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য। পুরাতন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়মানুযায়ী তখন পড়তে

হ'ত—ইংরাজী কম্পোজিসন, সংস্কৃত, দর্শন, ইংলণ্ডের আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, অর্থনীতি ও ভূগোল। এরপর Tripos-এর পড়া।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বাড়িতে সুভাষচন্দ্রকে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হ'ত। তজ্জন্য তিনি Tripos পরীক্ষার পড়া বাড়িতে করতে পারতেন না,—শুধু মাত্র ক্লাসের লেকচার শুনে যেটুকু হ'ত তার বেশী Tripos পরীক্ষার জন্য করতে পারতেন না তিনি। অবসরও নিতান্ত কম। চিত্ত-বিনোদনের জন্য তিনি শুধু "ভারতীয় মজলিস" ও "ইউনিয়ন সোসাইটি"র সভাসমিতিতে যোগদান করতেন।

ক্যামব্রিজের ভারতীয় ছাত্রগণ শিক্ষা ব্যাপারে সন্তোষজনক কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন। খেলাধুলাতেও তাঁরা পিছনে পড়ে ছিলেন না। গ্রেটব্রিটেনে ভারতীয় ছাত্রদের সমস্যা আলোচনার জন্য লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে একটি সরকারী সমিতি গঠিত হয় ১৯২৩ সালে। ক্যামব্রিজের ভারতীয় মজলিসের প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে এই সমিতির সামনে উপস্থিত হতে হয়। এখানে তিনি মন্তব্য করেন যে পরিণত শিক্ষার পর অর্থাৎ অন্ততঃ পক্ষে বি. এ পাশের পর ভারতীয় ছাত্রদের সাগরপারে শিক্ষালাভ করতে যাওয়া উচিত।

১৯২০ সালেই আই. সি. এস. পরীক্ষা হ'ল। পরীক্ষার পর সুভাষচন্দ্রের ধারণা হ'ল আই. সি. এস. পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারবেন না। সংস্কৃত পরীক্ষার ইংরাজী থেকে সংস্কৃত অনুবাদ (প্রায় দেড় শ' নম্বর)-এর খানিকটা বাদ থেকে

উত্তর পত্রে তুলবার আগেই ঘণ্টা পড়ে যায়। নূতন উদ্যমে তিনি 'ট্রাইপস' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

*　　*　　*

১৯২০ সাল। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি। লণ্ডনে তখন সুভাষচন্দ্র। এক বন্ধুর এক টেলিগ্রাম এল—Congratulations. See Moarning Post [সুসংবাদ। "মর্নিং পোস্ট দেখ।]

পরদিন সকালে তিনি "মর্নিং পোস্ট" কিনলেন। সুসংবাদই বটে। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং চতুর্থস্থান অধিকার করেছেন।

অর্থ ব্যয় করে সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস পড়লেন, কৃতিত্বের সাথে পাশও করলেন কিন্তু আই. সি. এস-এ যোগ দিলেন না। ইহা তাঁর জীবনের রোমঞ্চকর ও রহস্যময় ঘটনা।

আই. সি. এস পদ বর্জন

[এপ্রিল ১৯২১]

জালিয়ানওয়ালাবাগ। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ। চারিদিক ঘেরা ময়দান। একটি মাত্র প্রবেশ ও নির্গমের পথ।

এই ময়দানের সাধারণ একটি সমাবেশকে রাজনৈতিক সমাবেশ মনে করে ডায়ার নামক একজন গোরা সেনানী একদল গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে ঐ প্রবেশ ও নির্গম পথের মুখে দাঁড়ায় এবং কামান দাগে। ফলে সহস্রাধিক নিরপরাধ নরনারী, শিশু অকালে প্রাণ হারায়। সেদিন ১৯১৯ সালে এপ্রিল ছয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইংরাজের সাথে সহযোগিতা করে। ইংরাজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুদ্ধের শেষে ভারতকে দিবে স্বরাজ কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পরই ইংরাজ নিজ মূর্তি ধরল। জনমত অগ্রাহ্য করে বিপ্লববাদ দমনের নামে তাঁর পীড়নমূলক আইন "রাওলাট অ্যাক্ট" পাশ করে।

প্রতিবাদে পাঞ্জাবে বিক্ষোভ জাগে। গোরাদের সাথে পাঞ্জাবীদের সংঘর্ষ হয়। পাঁচজন গোরা নিহত হয়। তারই প্রতিশোধ জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। পাঁচজন গোরার জীবনের দাম নিরূপিত হ'ল সহস্রাধিক ভারতীয়ের রক্তে।...

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের সহিত ভারতীয় কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রতিদান জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। প্রতিশ্রুত স্বরাজের বদলে পৈশাচিক নিপীড়ন। অসহনীয় মর্মপীড়ায় ভারত কাতর।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের দেওয়া খেতাব "স্যার উপাধি" ত্যাগ করলেন। মহাত্মা গান্ধী ইংরাজের সাথে অহিংস অসহযোগিতা ঘোষণা করলেন, আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতিতে নামলেন।

নিপীড়িত লাঞ্ছিত ভারতের অঙ্গনে এল এক মহাজীবনের সাড়া। তারই স্পন্দন জাগল সেদিন সুভাষের বক্ষে সাগরপারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষের মনে আবাল্য-সঞ্চিত ধর্মভাব বদলে রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত হয়। মহাযুদ্ধের কালছায়ায় সুভাষ অনুধাবন করেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সামরিক শক্তি ছাড়া কোন আধুনিক জাতির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতিতে তিনি আরও অনুধাবন করলেন—নিপীড়ক বৃটিশ সরকারের অবসানের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের আশু প্রয়োজন ও আই. সি. এস. এ যোগদানেব অর্থ ভারতে বৃটিশ-শাসনের সহায়তা। তিনি আই. সি. এস. পদ বর্জন করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিতে মনস্থ করলেন।

আই. সি. এস. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর সুভাষচন্দ্র এসেক্সে লে-অন-সিতে অবসর যাপন করছিলেন। তিনি সেখান থেকে আই. সি. এস. পদ বর্জনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ১৯২০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে মধ্যম ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের নিকট পত্র লিখেন। অক্সফোর্ডে অবসর যাপনের সময় তিনি সেখান থেকে পুনরায় ৬ই এপ্রিল, ১৯২১ তারিখে এ সম্পর্কে তাঁর নিকট আর একখানি পত্র দেন। অবশেষে আই. সি. এস থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ক্যামব্রিজ থেকে তিনি ১৯২১ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে তাঁকে পত্র দেন এবং পদত্যাগের

পর ঐ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে ক্যামব্রিজ থেকে শেষ পত্র দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর এক বৎসর পর ভারত সচিবের একান্ত উপরোধ উপেক্ষা করে তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন।

বৃটিশ মহলে এ নিয়ে প্রবল গুঞ্জন শুরু হ'ল। তাঁদের ধরণা বৃটিশ আমলা-তন্ত্র অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিশিষ্ট একজন কর্মচারী হারালেন। সাহেবদের ধারণা ছিল আই. সি. এস-এর চাকুরী শিক্ষিত ভারতীয়দের নিকট মনলোভা বস্তু। এই লালাইত পদ কোন ভারতীয় যে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারে সুভাষের পূর্বে তা তাঁদের জানা ছিল না।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নিপীড়নের পর ভারত—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতারণার পর ভারত। সে ভারত সেদিন বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ দেখাল।

ক্ষুব্ধ ভারতবাসিগণ সেদিন শুনল সাগরপারে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক তরুণ বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভে আই. সি. এস. পদ বর্জন করেছেন। তখন তাঁর নামে পড়ে গেল সারা দেশময় জয়জয়কার।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে আন্দোলনে নামবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র একখানি পত্র দেন।

সে পত্রের উত্তরে চিত্তরঞ্জন লিখলেন—বর্তমানে দেশে সত্যিকার একনিষ্ঠ কর্মীর অভাব। তুমি এলে তুমি তোমার মনের মতন প্রচুর কাজ পাবে।

……দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে সাড়া দিলেন সুভাষ।

দেশবন্ধুর সাহচর্যে

অসহযোগ আন্দোলন ঃ স্বরাজ্যদল গঠন

[জুন, ১৯২১—২১শে অক্টোবর, ১৯২৪]

১৯২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সুভাষচন্দ্র ফিরলেন ভারতে। এর পূর্বে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Moral Science এর ট্রাইপস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দর্শন শাস্ত্রের অনার্স সহ বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচার বিভাগের কর্তৃত্ব ভার এবং বাংলার স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের নেতৃত্ব ভারও তিনি গ্রহণ করেন। এর পরই অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

প্রথম কারাদণ্ড : ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১—১৯২২

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর তারিখে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত গ্রেপ্তার হন। এই তাঁর জীবনের প্রথম কারাবাস।

তিনমাস হাজতবাসের পর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সাথে ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগারে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর একাধারে পাচক, প্রাইভেট সেক্রেটারি ও শিক্ষক ছিলেন। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের নিকট কারাগারে নীতিদর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কারাগার থেকে মুক্তি পান।

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কার্য—১৯২১

উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা হয় ঐ বৎসর। উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবন-সমিতির সম্পাদক হিসাবে তিনি তথায় উপস্থিত হন। ত্রাণকার্যে তিনি যথেষ্ট কর্মকুশলতার পরিচয় দেন।

স্বরাজ্যদল ও সুভাষচন্দ্র—(১৯২৩-২৪)

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের সভাপতি হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারানুযায়ী কাউন্সিল গঠনের যে প্রস্তাব দেশবন্ধু উত্থাপন করেন তা গৃহীত হয় এবং স্বরাজ্যদল নামক একটি উপদল কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্ট হয়। এই দলে জহরলালের পিতা মতিলাল নেহরু যোগ দিলেন। গান্ধীজির শিষ্যগণ এই পরিবর্তনে সায় না দেওয়ায় পরিবর্তন বিরোধী দল (No changer) রূপে খ্যাত হলেন। স্বরাজ্য দল গঠনের কাজে দেশবন্ধুর সহকারী হন সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র 'বাংলার কথা' নামক একখানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং "স্বরাজ্য দল"এর মুখপত্র ইংরাজী "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে তিনি "স্বরাজ্য দল"-এর পক্ষে প্রচার কার্য করেন। এই সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদে বৃত হন এবং 'Young Bengal Party'— 'বঙ্গীয় তরুণ সঙ্ঘ' নামক একটি দল গঠন করেন। শ্রমিক-গণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এই দলের অন্যতম কাজ ছিল।

কলিকাতা করপোরেশন ও সুভাষচন্দ্র—১৯২৪

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা করপোরেশনের নির্বাচন হয়। "স্বরাজ্য দল" এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং জয়ী হয়। দেশবন্ধু মেয়র নির্বাচিত হন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল তারিখে সুভাষচন্দ্র মাসিক তিন সহস্র টাকা বেতনে কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। সুভাষচন্দ্র বেতনের অর্ধেক মাত্র গ্রহণ করতেন। অনেক দ্বিধার পর বাংলা সরকার তাঁর এ নিয়োগ অনুমোদন করেন।

দ্বিতীয় কারাবাস ঃ

[২ শে অক্টোবর, ১৯২৪—১৫ই মে, '৯২৭]

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে সুভাষচন্দ্র ৩নং রেগুলেশনে বিনা বিচারে বন্দী হন এবং আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নীত হন। পরে এখান থেকে তিনি বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত হন। কয়েক মাস পরে সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে নির্বাসিত হন।

মান্দালয় অত্যধিক গরমের দেশ। এখানে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু সংবাদ পান। ১৯২৫ সনের জুন মাসে দেশবন্ধুর মৃত্যু ঘটে। দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে সুভাষচন্দ্র কাতর হন।

মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্রের সাথে আরও কয়েকজন রাজবন্দী ছিলেন। ধর্মোৎসবের জন্য সরকার তাঁদের কোনও ভাতা দিতেন না। এর প্রতিবাদে তাঁরা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। রেঙ্গুন ও কলকাতার সভায় রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সরকারের দুর্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করা হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য রাজবন্দীরা অনশন ত্যাগ করেন।

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের দিন দিন অবনতি ঘটে। অজীর্ণ রোগে তখন তিনি কাতর। পরে ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ

পায়। সুভাষচন্দ্র ইনসিন জেলে নীত হলেন। সুভাষচন্দ্রের ছোট দাদা ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসু ও সরকারী ডাক্তার সুভাষ-চন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষার পর তাঁরা ঘোষণা করলেন যে সুভাষচন্দ্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সরকার পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রের নিকট স্বাস্থ্যের জন্য ইউরোপ যাত্রার প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাব সুভাষচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিদেশে অবস্থানের প্রস্তাব তাঁর মনঃপূত হয়নি।

আলমোড়ায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য সুভাষচন্দ্রকে কলকাতায় আনা হ'ল। বাংলার নূতন গভর্ণর তখন স্ট্যানলি জ্যাকসন।

চিকিৎসকগণের পরামর্শে সুভাষচন্দ্র ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে বিনা সর্তে মুক্তি লাভ করলেন।

সারা ভারতে বিশেষতঃ বাংলায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হ'ল

কারা মুক্তির পর

[১৯২৮—২৯]

১৯২৮ সন—সাইমন কমিশন বর্জন :

শাসন ব্যাপারে ভারত কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছে তা জানবার জন্য বিলাত থেকে সাইমন কমিশন ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এলেন বোম্বাই শহরে। ব্রহ্মের কারাগার থেকে মুক্তির পর সুভাষচন্দ্র বাংলায় সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলন সংগঠন করেন। সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে এসে ইতস্ততঃ ঘুরলেন আর তাঁদের পিছনে ঘুরল কাল-নিশান হাতে ভারতের যুবকগণ। মুখে তাদের ধ্বনি—"সাইমন ফিরে যাও।"

১৯২৮ সন—ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কলিকাতা অধিবেশন :

১৯২৮ সনের মে মাসে পুণাতে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য সুভাষচন্দ্র আহূত হন। এ সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন সবরমতী আশ্রমে।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেস) অধিবেশন বসে কলকাতায়। সভাপতি মতিলাল নেহরু। জাতীয় মহাসভার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল কম্যাণ্ডিং অফিসাররূপে সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় সভাপতির অভ্যর্থনার জন্য বিরাট শোভাযাত্রা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান যে অপূর্ব আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হয় তার দৃষ্টান্ত ভারতের জাতীয় ইতিহাসে বিরল।

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব ছিল বৃটিশ সরকার নেহরু কমিটি রচিত কংগ্রেসের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন) এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে মেনে নিলে কংগ্রেস তা গ্রহণ করবে।

এই আপোষ-রফা মূলক প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন সুভাষচন্দ্র। বৃটিশের সহিত সম্পূর্ণভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছেদের তিনি প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র গৃহীত না হলে কংগ্রেস শুরু করবে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য 'আইন-অমান্য আন্দোলন'।

কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দুস্থান সেবাদলের সম্মেলন হয়। এর সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র।

১৯২৯ সন—নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বৃত ছিলেন।

১৯২৯ সন—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন ঃ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলার গবর্ণর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দিলেন এবং নূতন নির্বাচনের আদেশ দিলেন। জুন মাসে নূতন নির্বাচন হ'ল। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় এই নির্বাচনে সরকার-পক্ষীয় প্রার্থিগণ পরাজিত হন এবং কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থিগণ বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হন।

১৯২৯ সন—নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস ঃ

১৯২৯ সনের আগষ্ট মাসে নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক-দিবস পালন উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়। সুভাষচন্দ্র তখন পাঞ্জাব ভ্রমণে রত। পাঞ্জাব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হন এবং জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

১৯২৯ সাল—যতীন দাসের আত্মদান :

১৯২৯ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি চলছিল তখন। মামলার অন্যতম আসামী যতীন দাস রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সদ্‌ব্যবহারের দাবীতে অনশন করেন এবং একষট্টি দিন উপবাসে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃতদেহ কলকাতায় নীত হলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা বার হয়।

১৯২৯ সাল—লাহোরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন :

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাস। লাহোরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসে। সভাপতি জওহরলাল নেহরু। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব ছিল—অবিলম্বে পূর্ণস্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠন—যাহা বার বৎসর পর ১৯৪২ সনে আগষ্ট আন্দোলনের সময় গান্ধীজি পরিচালিত কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি হয়। সেদিন সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। এই সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাত্মাজীর নির্দেশিত কার্যপ্রণালী গৃহীত হয়।

তৃতীয় কারাদণ্ড ঃ

[২৩শে জানুয়ারী. ১৯৩০ -২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০]

১৯৩০ সাল। স্বাধীনতা সংগ্রামের গৃহীত কার্যপ্রণালী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে গৃহীত হল। গান্ধীজি শিষ্যগণসহ সবরমতী আশ্রম থেকে বোম্বাই-এ সমুদ্রতীরে ডাণ্ডি নামক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য যাত্রা করলেন।

কংগ্রেসের দাবী ছিল ১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দান—অন্যথায় পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন। বৃটিশ এই দাবী উপেক্ষা করায় গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনে উদ্যোগী হলেন।

৬ই এপ্রিল জাতীয় সংগ্রামের প্রথম দিবস। জালিয়ানওয়ালা বাগ (১৯১৯)-এর নিষ্ঠুর স্মৃতি বহন করে এই দিনটি। এই দিন ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে গান্ধীজি স্বয়ং এই লবণ আইন ভঙ্গ করেন। ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল জাতীয়-সপ্তাহ। এই সপ্তাহে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে নিজ নিজ এলাকায় লবণ আইন ভঙ্গ করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার নির্দেশ দিলেন গান্ধীজি।

আইন অমান্য আন্দোলনে চঞ্চল হয়ে উঠল বাংলা। শাসকের চণ্ডনীতির মধ্যে বাংলার বিপ্লববাদ সক্রিয় হয়ে উঠল আবার। দেশব্যাপী এই মহাজাগরণের মধ্যে সুভাষচন্দ্র থাকতে পারেননি। তিনি তখন কারাগারে বন্দী।

…১৯২৯ সনের আগষ্ট মাসে নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিকদিবস পালন উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রের নামে আদালতে মামলা রুজু হয়। সুভাষচন্দ্র জামিনে মুক্ত ছিলেন। বিচারে ১৯৩০ সনের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে তিনি নয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন এবং কারাগারে নীত হলেন। ১৯৩০ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে যখন তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন তখন আইন অমান্য আন্দোলনের গতি মন্দ, আর বন্দী গান্ধীজি সরকারের সাথে আপোষ আলোচনায় রত কিন্তু বাংলায় চলছে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ।

চতুর্থ কারাদণ্ড ঃ

[জানুয়ারী—১৯৩১]

গান্ধী ও জওহরলাল তখনও বন্দী। মতিলাল নেহরু রোগশয্যায়। বাইরে আন্দোলনের গতি মন্দ।

১৯৩১ সন—জানুয়ারী মাস। সুভাষচন্দ্র উত্তর বঙ্গ-পরিভ্রমণে রত। মালদহ জেলার সীমান্তে ট্রেনের কামরায় পুলিশ সুভাষচন্দ্রের উপর ১৪৪ ধারা জারী করল এবং তাঁর মালদহ জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। সুভাষচন্দ্র এ নিষেধাজ্ঞা মানতে অস্বীকৃত হলেন। ফলে তিনি গ্রেপ্তার হলেন।

স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে সুভাষচন্দ্রের বিচার হ'ল। বিচারে সাতদিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। বাইরের লোকরা যাতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে না পারে তজ্জন্য গোপনে বন্দী সুভাষকে রাজশাহী নাটোর হয়ে কলকাতায় আনা হ'ল। কলকাতায় আলিপুর সেণ্টাল জেলে সুভাষচন্দ্র নীত হলেন।

পঞ্চম কারাদণ্ডঃ

[২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০—৮ই মার্চ, ১৯৩১]

১৯৩১ সনের ২৬শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা দিবস। শহরে ১৪৪ ধারা। শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেদিন সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করেন। শোভাযাত্রায় পুলিশের লাঠি চালনা হয়। আহত অবস্থায় সুভাষ-চন্দ্র গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আবার কারাগারে সুভাষ। বৃটিশ সরকারের সাথে কংগ্রেসের আপোষ-আলোচনা তখন অনেকদূর অগ্রসর। ইংলণ্ডে তখন "গোল টেবিল বৈঠক" চলছিল। গোলটেবিল বৈঠকের অবসানে সেদিন সাধারণভাবে সকল রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ তারিখে মতিলাল নেহরু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মতিলালের মৃত্যুর পর দিল্লীতে বড়লাটের সাথে গান্ধীজির আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর ফলে যে চুক্তি হয় তাকে দিল্লী-চুক্তি বা গান্ধী-আরুইন চুক্তি (১৯৩১) বলা হয়। ৪ঠা মার্চ তারিখে মধ্যরাত্রিতে গান্ধীজি চুক্তিতে সম্মতি দিলেন।

দিল্লী-চুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের অবসান ঘটে এবং সকল রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পান। দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হবার বহু পূর্বেই ৮ই মার্চ, ১৯৩১ তারিখে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি গান্ধীজির রাজনৈতিক আপোষ-মীমাংসা ও দিল্লীচুক্তির বিরোধিতা করেন। এর পর থেকে সুভাষের আপোষ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়।

ষষ্ঠ কারাবাস ঃ

[২রা জানুয়ারী, ১৯৩২—২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩]

দিল্লী-চুক্তির নায়ক বড়লাট আরুইন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই ভারত ত্যাগ করলেন। নূতন বড়লাট এলেন উইলিংডন—অত্যন্ত কড়া ও শক্ত লোক। চুক্তি চুক্তিই থাকল, সরকারী চণ্ডনীতি সমভাবেই চলল। বাংলার বিপ্লব-বাদীদের উপর, সীমান্তের লাল কোর্তাদলের উপর সরকারী চণ্ডনীতি প্রবল হ'ল। দিল্লী চুক্তিতে শান্তি এল না দেখে গান্ধীজি দ্বিতীয় 'গোলটেবিল বৈঠকে' যেতে রাজী হলেন এবং আগষ্ট মাসের শেষে (১৯৩১) বিলাত যাত্রা করলেন। এই বৈঠকে প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকে গান্ধীজি Post dated cheque আখ্যা দিলেন। শূন্য হাতে তিনি ভারতে প্রত্যার্তন করলেন।

গান্ধীজির ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর বোম্বাই-এ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। সুভাষচন্দ্র তখন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নন। ১৯৩২ সনের শেষাশেষি তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এই বৈঠকে সুভাষচন্দ্র বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হন।

বড়লাট আরুইন ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন পরিকল্পনা কংগ্রেস নেতাদের নিকট উত্থাপন করেন এবং পরিকল্পনা রচনায় বৃটিশ সরকারের সাথে কংগ্রেস নেতাদের সহযোগিতা কামনা করেন। উক্ত বৈঠকে মহাত্মাজী প্রমুখ

নেতৃবর্গ সহযোগিতা জ্ঞাপন করে বিবৃতি প্রচার করেন কিন্তু বাংলার সুভাষ ও পাঞ্জাবের ডাঃ কিচলু ঐ বিবৃতিতে সাক্ষর করতে অস্বীকৃত হন। সুভাষচন্দ্র বলেন যে ঐ বিবৃতি কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবের সাথে সম্পর্কহীন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পরে সুভাষচন্দ্র বোম্বাই থেকে কলকাতার পথে যাত্রা করলেন। বোম্বাই থেকে ত্রিশ মাইল দূরে কল্যাণ নামক স্টেশনে হঠাৎ ডাক গাড়ি থেমে যায়। সুভাষচন্দ্রের কামরায় পুলিশ প্রবেশ করে এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের 'তিন আইন' অনুসারে সুভাষচন্দ্রের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করল।

সেদিন ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী। সুভাষচন্দ্র বিনা-বিচারে আটক হলেন এবং মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত সিউনি সাব-জেলে নীত হলেন। এই সুভাষের ষষ্ঠ কারাবাস :

কয়েক মাস পর সুভাষচন্দ্র জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হন। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তিনি কিছুদিন বাদে ভাওয়ালি স্বাস্থ্যনিবাসে প্রেরিত হন। অতঃপর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌর বলরামপুর হাসপাতালে আসেন। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ আশঙ্কাজনক হয়।

বহু বিবেচনার পর বৃটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যেতে সম্মতি দেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক বছর এক মাস কারাবাসের পর তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁর ইউরোপ যাত্রা ও ৩ বছর ইউরোপবাস বাধানিষেধ ও শর্তাধীন। তাই এই ইউরোপ যাত্রা ও ইউরোপবাসকে বলা যায় নির্বাসন।

ইউরোপে নির্বাসন ঃ

[২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩—মার্চ, ১৯৩৬]

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে ভিয়েনাতে উপনীত হন এবং কার্থে স্বাস্থ্যাবাসে অবস্থান করেন। ভারতের প্রবীণ নেতা বিঠল ভাই প্যাটেল চিকিৎসার জন্য এখানে ছিলেন। এখানে আসার এক মাস পরেই সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবার প্রতিবাদে বিঠলভাই প্যাটেলের সহিত যুক্ত ভাবে এক বিবৃতি প্রচার করেন।

ভিয়েনাতে বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যু :

অল্প কিছুদিন পরই ভিয়েনাতে বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যু হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর শব ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

পিতা জানকীনাথ বসুর মৃত্যু (২রা ডিসেম্বর ১৯৩৪) :

অসুস্থ পিতাকে দেখবার জন্য বহু আবেদনের পর সুভাষচন্দ্র ভারতে আসবার অনুমতি পান কিন্তু অনুমতি যখন পেলেন তখন পিতা জানকীনাথ বসুর শেষ মুহূর্ত। তিনি ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৪ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৩৪) তারিখে কলকাতার বাসভবনে উপনীত হলেন। মৃত্যু-শয্যায় পিতাকে শেষবারের মত দেখবার সৌভাগ্য সুভাষচন্দ্রের হ'ল না!

সাতদিন অন্তরীণ অবস্থায় গৃহে থাকবার অনুমতি ছিল সুভাষচন্দ্রের। পরে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত তাঁকে তাঁদের

এলগিন রোডের বাসভবনে অন্তরীণ অবস্থায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধ কার্য সমাপনের পর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি পুনরায় ভিয়েনার পথে যাত্রা করেন।

"ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" প্রকাশ (১৯৩৫)

ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের পর সুভাষচন্দ্র তাঁর লিখিত 'Indian struggle' নামক পুস্তকখানি প্রকাশনার জন্য লণ্ডনে প্রেরণ করেন। Indian struggle (ভারতের সংগ্রাম) লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আর একখানি ইতিহাসও তিনি লিখতে শুরু করেন কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তিনি তা শেষ করতে পারেন না।

বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ ডামিয়েল কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের দেহে অস্ত্রোপচার হয় (১৯৩৫) এবং সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। ভিয়েনার বাইরে থেকে আহ্বান এলেও বৃটিশ সরকারের অনুমতি না থাকায় তিনি কোন সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েও যোগদান করতে পারেননি। শুধুমাত্র ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রোমে মুসোলিনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এশিয়াবাসী ছাত্রদের সম্মেলনে যোগদান করতে অনুমতি পান। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের তৃতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আয়ার্লণ্ডে আসেন। অতঃপর তিনি জাহাজে ভারতের পথে যাত্রা করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইবন্দরে পৌছিলে সুভাষচন্দ্র ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে পুনরায় বন্দী হন।

সপ্তম কারাবাস ঃ

[৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬—১৭ই মার্চ, ১৯৩৭]

বন্দী সুভাষ বোম্বাই-এ আর্থার রোড ফাঁড়িতে নীত হন। সেখানে পাঁচদিন অন্তরীণ থাকার পর তিনি পুণার যারবেদা জেলে স্থানান্তরিত হন। পাঁচ সপ্তাহ তিনি এখানে অন্তরীণ থাকেন।

অতঃপর তিনি কার্শিয়াং-এর গির্দা পাহাড়ে মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে অন্তরীণ হন। পরে চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতার মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন।

সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে ভারতব্যাপী অসন্তোষ। সরকার ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে সুভাষচন্দ্রকে বিনাসর্তে মুক্তি দিলেন।

দ্বিতীয় বার ইউরোপে

[১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭—২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৮]

মুক্তির পর সুভাষচন্দ্র পাঁচ সপ্তাহকাল কলকাতায় অবস্থান করেন। ২৫শে এপ্রিল (১৯৩৭) তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন এবং বায়ু-পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর পার্বত্যঅঞ্চল ডালহৌসিতে গমন করেন। সেখানে তিনি ডাঃ ধরমবীরের গৃহে অবস্থান করেন। পাঁচ মাস কাল তিনি এখানে ছিলেন। ৭ই অক্টোবর (১৯৩৭) তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

৯ই অক্টোবর (১৯৩৭) তারিখে মাত্র দু'দিন কলকাতায় থাকার পর সুভাষচন্দ্র পুনরায় বায়ু-পরিবর্তনের জন্য কার্শিয়াং যাত্রা করেন। মাত্র একপক্ষ কাল সেখানে অবস্থানের পর তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

স্বাস্থ্যলাভের জন্য ১৮ই নভেম্বর (১৯৩৭) তারিখে সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে ইউরোপ যাত্রা করেন। এই তাঁর দ্বিতীয়বার ইউরোপে গমন।

প্রথমে তিনি যান অষ্ট্রিয়ার বাদগাস্তিনে। সেখানে তিনি ছ' সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং চিকিৎসা করান। ১০ই জানুয়ারী (১৯৩৮) তিনি লণ্ডনে যান এবং সম্বর্ধনা লাভ করেন।

ভারতীয় জাতীয়-মহাসভার ৫১তম অধিবেশন বসছে ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) তারিখে হরিপুরায়। মহাসভার সম্পাদক

আচার্য কৃপালনির ঘোষণায় ১৮ই জানুয়ারী (১৯৩৮) প্রচারিত হ'ল সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র ভারতের পথে যাত্রা করলেন।

২৪শে জানুয়ারী (১৯৩৮) তারিখে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

হরিপুরা কংগ্রেস

[১৯শে ফেব্রুয়ারী—১৯৩৮]

নূতন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার (Government of India Act—1935) প্রবর্তিত হ'ল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য-এর মূল সংস্কার। শাসনতন্ত্র কংগ্রেস অগ্রাহ্য করল কিন্তু জন-সংযোগের স্বার্থে কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামল। নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হ'ল। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা এবং সিন্ধু, বংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

পুরাতন সরকারী কর্মচারীরা বেশীর ভাগ কংগ্রেস মন্ত্রীদের আয়ত্তের বাইরে—অনেকাংশে শত্রুভাবাপন্ন। ফলে কংগ্রেস মন্ত্রীরা ইচ্ছামত উন্নতিমূলক কাজ ত্বরান্বিত করতে পারছিলেন না। উন্নতি মন্থর হওয়ায় অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ধীরপন্থী ও প্রগতি-পন্থীদের বিরোধ প্রকট হ'ল। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী জওহরলাল। এবার হরিপুরা কংগ্রেসে প্রগতিশীলতার নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

বার্দ্দৌলি স্টেশনে নেমে যেতে হয় হরিপুরা গ্রামে। পরলোকগত রাজনৈতিক নেতা বিঠলভাই প্যাটেলের নামে অধিবেশন স্থলের নাম রাখা হয় 'বিঠলনগর'।

সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন ও

সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেন এবং জাতীয় ঐক্যবৃদ্ধিতেও ট্রেড ইউনিয়ন এবং কিষাণ আন্দোলনের শক্তি-বৃদ্ধিতে কংগ্রেস কর্মিগণের উপদেশ দিলেন। সভাপতির মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন—বৃটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদই ভারতের চরম লক্ষ্য।

সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন: কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নয়—বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম।

কেবলমাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি না—সর্বসাধারণের মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি।

ভারতের স্বাধীনতার সহিত বিশ্বমানবের মুক্তি-সমস্যা বিজড়িত।

ত্রিপুরী কংগ্রেস

[১০ই মার্চ, ১৯৩৯]

পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশন—ত্রিপুরী। সভাপতি পদের জন্য তিন জনের নাম প্রস্তাবিত হয়—সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া। মৌলানা আজাদ ডাঃ সীতারামিয়ার পক্ষে নিজ নাম প্রত্যাহার করেন।

সভাপতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাঞ্ছনীয় নয়। সুভাষচন্দ্র প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ও সংগ্রামাত্মক কর্মপ্রণালী গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। তিনি তাই পান বামপন্থীদের অকুণ্ঠ সমর্থন। সুভাষচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে এবং বিনা সম্মতিতে সুভাষচন্দ্রের নাম সভাপতিপদের জন্য প্রস্তাবিত হয়। তিনি যাতে নাম প্রত্যাহার না করেন তজ্জন্য সমস্ত বামপন্থীদল তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। নীতিগতভাবে তাই সুভাষ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে পারলেন না। অপর পক্ষে গান্ধীপন্থী নামজাদা নেতাগণ ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার নির্বাচন সর্ববাদিসম্মত হতে আবেদন জানান।

অগত্যা সভাপতি-পদের জন্য নির্বাচন হ'ল। ৩০শে জানুয়ারী (১৯৩৯) তারিখে নির্বাচনের ফলাফল বার হ'ল। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ১৫৭৫ ভোট এবং ডাঃ সীতারামিয়ার পক্ষে ১৩৭৬ ভোট। আপোষ-বিরোধী সুভাষচন্দ্র ১৯৯ ভোটে ডাঃ সীতারামিয়াকে পরাজিত করে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতির পদ লাভ করলেন।

কংগ্রেসে একাধিকবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নয়জন। তন্মধ্যে জওহরলাল তিনবার। বাকি আটজন দু'বার। তন্মধ্যে বাঙালী চারজন। এর মধ্যে পর পর দু'বার সভাপতি হয়েছেন দু'জন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ (১৯০৭)-এ সুরাট আর ১৯০৮-এ মাদ্রাজ) ও সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৩৮-এ হরিপুরা আর ১৯৩৯-এ ত্রিপুরী)।

ডাঃ সীতারামিয়ার পরাজয়কে গান্ধীজি নিজ পরাজয় বলে মনে করলেন। শরৎচন্দ্র বসু বাদে ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্য পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা করতে বিরত হলেন।

এ সময় সুভাষচন্দ্র অসুস্থ ছিলেন। ব্যাধির মধ্যেও দৃঢ়চেতা সুভাষ আপোষহীন সংগ্রামের আদর্শে অটল রইলেন। তিনি গান্ধীজি ও অন্যান্য নেতাদের মনোভাব পরিবর্তনের অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

৫ই মার্চ রবিবার রাত্রিতেই, আই, আরের বোম্বাই মেল-যোগে গায় জ্বর নিয়ে অসুস্থ সুভাষ ত্রিপুরীতে চললেন। ১০ই মার্চ তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল।

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা তখন আশঙ্কাজনক। তাঁর পীড়ার সুযোগ নিয়ে দক্ষিণপন্থী বিরোধী নেতাগণ প্রস্তাব তুলে এমন ভাবে বাগবিতণ্ডা শুরু করলেন যাতে অসুস্থ সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। গান্ধীজি ত্রিপুরীতে অনুপস্থিত ছিলেন। তখন গান্ধীজি রাজকোটের শাসন সংস্কারের দাবীতে রাজকোটে অনশনরত। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হ'ল কিন্তু দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে কোন মীমাংসা হ'ল না।

কংগ্রেসের অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য ২৮শে এপ্রিল (১৯৩৯) তারিখে কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসে। এখানেও চলল দুই পক্ষে বাদানুবাদ। আপোষপন্থী মনোভাবসম্পন্ন দক্ষিণ-পন্থীদের নিয়ে আপোষ-বিরোধী সংগ্রামশীল সুভাষচন্দ্রের চলা হল কঠিন। জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। আপোষ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য "ফরওয়ার্ড ব্লক" নামক একটি স্বতন্ত্র প্রগতিশীল দল সুভাষচন্দ্র গঠন করলেন। স্বীয় ব্যক্তিত্বের গুণে অত্যল্পকালের মধ্যে "ফরওয়ার্ড ব্লক"কে একটি শক্তিশালী নিখিল ভারত সংগঠনে পরিণত করলেন।

দক্ষিণপন্থীদের হাতে এসে পড়ল কংগ্রেস। নূতন কার্যকরী-সমিতির সিদ্ধান্তে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস থেকে তিন বৎসরের জন্য কংগ্রেস হ'তে বহিস্কৃত হলেন।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন বসল রামগড়ে। কংগ্রেস অধিবেশনের অনতি দূরে কংগ্রেসের শাস্তি-প্রাপ্ত নেতা সুভাষের আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সমবেত হ'ল হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষের দল। তাঁদের সামনে প্রশ্ন—যুদ্ধ……পূর্ণ স্বাধীনতার যুদ্ধ।

…১৯৪০ সন। যুদ্ধের ছায়া নেমেছে ইউরোপে।

* * * *

অষ্টম কারাবাস

[১৯৪০]

১৯৪০ সন। যুদ্ধের ছায়া নেমেছে ইউরোপে। একদিকে ইংরাজ, আমেরিকা—অন্যদিকে জার্মান, ইটালী। ইংরাজের বিপদ পরাধীন ভারতের স্বাধীনতালাভের অপূর্ব সুযোগ। সুভাষ-চন্দ্র একাকী সেই সুযোগের অপেক্ষায় রত।

লালদীঘির মোড়ে অবস্থিত তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যা স্মৃতিসৌধ (হলওয়েল মনুমেণ্ট)। ইহা অপসারণের চেষ্টা কয়েকবার ব্যর্থ হয়। ১৯৪০ সনে ইহা অপসারণের জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে আন্দোলন শুরু হয়। এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র মহম্মদ আলি পার্কে বক্তৃতা দেন এবং প্রবন্ধ লিখেন। এর ফলে ভারতরক্ষ-আইনে সুভাষচন্দ্র আটক হন।

বাংলা সরকারের আদেশে মনুমেণ্ট অপসারিত হয় কিন্তু সুভাষচন্দ্র মুক্তি পান না। অন্যায় আটকের প্রতিবাদে ভগ্ন-স্বাস্থ্য সত্ত্বেও অনশন ব্রতের সঙ্কল্প জানিয়ে বাংলার গভর্ণরকে সুভাষচন্দ্র একখানি পত্র লিখেন।

২০শে নভেম্বর (১৯৪০) তারিখে সুভাষচন্দ্র মুক্তি পান কিন্তু গৃহে অন্তরীণ হন।

রুদ্ধ কক্ষে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন সুভাষ। এ কক্ষে অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

১৯৪১ সন। জানুয়ারী মাস। সুভাষচন্দ্র নিজ কক্ষে মৌনী সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করতেন। হঠাৎ ২৩শে

জানুয়ারী রাত্রিশেষে প্রভাতে দেখা গেল রুদ্ধ কক্ষ মুক্ত কিন্তু শূন্য—সুভাষ নাই।

সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক রহস্যজনক অন্তর্ধান। সেদিন সাধারণ লোকের ধারণা হয় যে তিনি সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট।

কে জানত সেদিন ইউরোপের রণ-কোলাহলের মধ্যে তিনি খুঁজছেন তখন ভারতের মুক্তি।

জাতীয় বাহিনী গঠন

১লা অক্টোবর, ১৯৪২।

সহসা বার্লিন রেডিও-তে শোনা যায় নিরুদ্দিষ্ট সুভাষের কণ্ঠস্বর:

> ‘জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ইউরোপে একটার পর একটা রাষ্ট্র তাসের দেশের মত পতিত হচ্ছে। ইংরেজের সামরিক শক্তি আজ সর্বত্র বিপর্যস্ত। আমি ড্রেসডেনে ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটা ‘জাতীয় বাহিনী’ গঠন করেছি। জার্মানীর অধিনায়ক আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করছেন। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আমার সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই অভিযান আরম্ভ করবে। সময় প্রসন্ন—স্বাধীনতার বিলম্ব নেই।’

ইউরোপ—সংঘর্ষ-সঙ্কুল ইউরোপ সেদিন। ফ্যাসিস্ত চক্র-শক্তির আক্রমণে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে নরওয়ের, মে মাসে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের এবং জুন মাসে ফ্রান্সের পতন ঘটল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ’ল শুরু। ব্রিটিশের শত্রুদের সহায়তায় ভারতের মুক্তি আনয়ন সেদিন ছিল সুভাষের স্বপ্ন।

১৯৪১ সনে জানুয়ারী মাসের শেষে একদিন তিনি ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগ করে মস্কোর পথে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে জার্মান তার সহযোগী রাষ্ট্র রাশিয়া আক্রমণ করে। ফলে রাশিয়া

মিত্রপক্ষে যোগদান করায় তিনি মস্কোতে যেতে পারলেন না,—এলেন বার্লিনে। মিশর ও লিবিয়ার রণক্ষেত্রে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৪২ সনের স্বাধীনতা দিবসে (২৬শে জানুয়ারী) গঠন করলেন "স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী।"

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালো ছায়া নামে সুদূর প্রাচ্যে। জাপান চক্রশক্তিতে যোগদান করে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু করল।

১৯৪১ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপানীদের হাতে পার্ল বন্দরের পতন ঘটল। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের জয়যাত্রা শুরু হয়। একে একে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ, ফরাসী ও ডাচের ঔপনিবেশিক দ্বীপগুলির জাপানীদের হাতে পতন ঘটে।

অবশেষে সুদৃঢ় ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে ১৯৪২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মালয়ের যুদ্ধে বন্দী ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ড্রেসডেনে গঠিত সুভাষচন্দ্রের "স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী"র অনুকরণে সিঙ্গাপুরে গঠিত হ'ল "আজাদ হিন্দ ফৌজ"।

জার্মান থেকে সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় সারা সুদূর প্রাচ্য হয়ে উঠল চঞ্চল। জাপান-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিও-তে প্রবাসী ভারতীয়দের একটি সম্মেলন হয় ২৮শে মার্চ (১৯৪২)-এ এবং ২৪শে জুন তারিখে (১৯৪২) "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ" অথবা আই. আই. এল (স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ) নামক ভারতীয়দের একটি সঙ্ঘ গঠিত হয়। প্রায় এক লক্ষ ভারতীয় এর সভ্য হন এবং সুদূর প্রাচ্যে এর বাইশটি শাখা স্থাপিত হয়। এই সঙ্ঘের সেনাদল "আজাদ হিন্দ

ফৌজ"। ফৌজের সভাপতি রাসবিহারী বসু এবং নায়ক রাঘবন্, মেনন, মোহনসিং ও গিলানি।

২০শে জুন—১৯৪৩ সন :

রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণে ১৯৪৩ সনের ২০শে জুন তারিখে বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্র এলেন টোকিও-তে।

২রা জুলাই তারিখে তিনি সিঙ্গাপুরে আসেন এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

ড্রেসডেনে গঠিত সুভাষচন্দ্রের "স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী" ইউরোপ-খণ্ডে ইংরাজ-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তখন রত। এই বাহিনীকে জার্মানগণ "ফ্রি ইণ্ডিয়ান" বলতেন। সুয়েজ পার হয়ে পারস্য-ইরাণ-আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে এই বাহিনীর দিল্লী প্রবেশের ইচ্ছা ছিল।

আজ সুভাষচন্দ্রের সর্বাধিনায়কত্বে গঠিত সিঙ্গাপুরস্থ 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' পূর্ব-সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত। দু'মুখী ভারত অভিযানের পরিকল্পনা তৈরী হ'ল।'

স্বাধীন সরকার গঠন

[সিঙ্গাপুর—২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩]

স্বাধীন ভারতীয় বাহিনীর জন্য চাই স্বাধীন সরকার। অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মতই স্বাধীন। সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে সুভাষচন্দ্র 'ভারতের অস্থায়ী সরকার' ঘোষণা করলেন। এ সরকারের নাম—

আরজি হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দ্

অর্থাৎ অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার।

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলী, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিগণ ও সহকারী উপদেষ্টাগণের নাম ঘোষণা করলেন এইদিন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র হলেন রাষ্ট্রবিধায়ক, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও পররাষ্ট্রসচিব। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের আশী হাজার সেনানী সুভাষচন্দ্রকে অভিবাদন করতঃ চীৎকার ধ্বনি তুলল ঃ নেতাজী!

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের

অভিবাদন : জয়হিন্দ

জাতীয় পতাকা : চরকা সম্বলিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা

প্রতীক : এশিয়ার মানচিত্রের উপরে বাঘের সঙ্গে টিপু সুলতানের মূর্তি

সেনাদল : আজাদ হিন্দ ফৌজ
ঝাঁসীর রাণী বাহিনী (নারীবাহিনী)
বালসেনা (বালক বাহিনী)
বাহাদুর শা আত্মঘাতী বাহিনী

রণহুঙ্কার : চলো দিল্লী

জয়ধ্বনি : আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ
ইনকিলাব (বিপ্লব) জিন্দাবাদ

মূলমন্ত্র : ইত্তিফাক (একতা)
ইত্তমদ (বিশ্বস্ততা)
কোরবানি (আত্মবলি)

উদ্দেশ্য —ভারতের স্বাধীনতা

জাতীয় সঙ্গীত :

জনগণ মন-অধিনায়ক
জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।......

—রবীন্দ্রনাথ।

সমর সঙ্গীত :

কদম কদম বঢ়ায়ে জা,
খুশীকা গীত গায়ে জা
এ জিন্দিগী (জীবন) হ্যায় কোমকি, (জাতির জন্য)
তো কোম্‌পে লুটায়ে জা।

তু শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়
মরণেসে ফিরভি তুন ডর,
আসমান তক্ উঠাকে সর্
যোশে বতন (দেশের শক্তি) বঢ়ায়ে জা।

তেরি হিম্মৎ বঢ়তি রহে,
খুদা তেরি শুনতো রহে,
যো সাম্‌নে তেরে চঢ়ে
তো থাক্‌মে (ছাই সাথে) মিলায়ে জা।

চলো দিল্লী পুকারকে
কোমী মিশান সামহালকে
লাল কিল্লে গাড়কে
লহরায়ে জা লহরায়ে জা।

অস্থায়ী 'স্বাধীন ভারত সরকার' চক্রশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত হল এবং স্বাধীন সরকারের সমান মর্যাদা লাভ করল। অস্থায়ী 'স্বাধীন ভারত সরকারের' অনুষ্ঠানাদির সময় নেতাজীর সাথে তোজো এবং হিটলার ভারতীয় পতাকাকে অভিবাদন করতেন। আইরিশ ফ্রি-ষ্টেট থেকে ডি-ভ্যালেরা এই রাষ্ট্রের শুভ কামনা করেন।

এই সরকার ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে বৃটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

অভিযান ঃ

[১৯৪৩—৪৫]

১৯৪৩ সনের শেষাশেষি। 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' ব্রহ্ম ও আরাকান ফ্রন্টে জয়লাভ করে অগ্রসর হতে থাকে এবং ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছায়। জাপানাধিকৃত রাজ্য, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অস্থায়ী-স্বাধীন ভারত সরকারের অধিকারে এল। আন্দামানের নামকরণ হ'ল 'স্বরাজ দ্বীপ' আর নিকোবরের নামকরণ হ'ল 'শহীদ দ্বীপ'। অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার 'অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার' গ্রহণ করে। মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জি অধিকৃত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সারা পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয় এখন অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের অধীন। তারা কর দেয় যথারীতি।

১৯৪৪ সন। ফেব্রুয়ারী মাস।

বোমা ও গোলা বর্ষণ উপেক্ষা করে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' ভারত সীমান্ত অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়। এপ্রিল মাসে নেতাজী 'আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কোহিমা ও মণিপুর অধিকার করে। ১৮ই মার্চ (১৯৪৪) তারিখে মণিপুরে স্বদেশের স্বাধীন মাটিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।

বর্ষা শুরু হল। প্রবল বর্ষায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন; খাদ্য নাই, পোশাক নাই, রসদ নাই। পূর্ব কথা মত

জাপানীদের বিমান বাহিনী এল না। প্রয়োজনের সময় জাপানীরা পিছপাও হ'ল। সুভাষচন্দ্র সৈন্যদের সাথে সিদ্ধ ঘাস খেয়ে বর্ষা অবসানের অপেক্ষায় থাকেন এবং বর্ষান্তে পুনরাক্রমণের কথা ভাবেন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ। ৩১শে জানুয়ারী।

শাহ নওয়াজ ও সাইগল সৈন্যবাহিনী সহ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। পোপা পাহাড় রক্ষার ভার নিলেন ধীলন। লেগি রণাঙ্গন ও থানবিন রণাঙ্গণে যুদ্ধ চলে। শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।

পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সুভাষচন্দ্র এপ্রিলের শেষে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন এবং পদব্রজে সিঙ্গাপুরে আসেন। বর্মা-সরকার আত্মসমর্পণ করায় ইংরাজ ও আমেরিকান সৈন্যগণ রেঙ্গুনে প্রবেশ করে। সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, আর যুদ্ধ সম্ভব নয়—কারণ বর্মা যুদ্ধ করতে আর রাজি নয়, জাপানও পিছপাও।

আসামের জঙ্গলে আটক অবস্থায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যগণ ইংরাজ ও আমেরিকার সৈন্যদলের হাতে বন্দী হ'ল।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের পরবর্তী ঘটনা আমাদের অজানা। অন্তর্ধান থেকে ভারত-অভিযানের অবসান পর্যন্ত ঘটনাও সম্পূর্ণ নয়। দর্পী বৃটিশশক্তির দর্প চূর্ণ করেছিলেন বাংলার সন্তান সুভাষ। বাঙালীর বীর্যহীনতা অপবাদ তিনি দূর করেছেন আজীবন সংগ্রামশীলতার মাধ্যমে। এ এক মহান্ কাহিনী। এর সঠিক, সুসমঞ্জস ও সংহত ইতিবৃত্ত দরকার।

কে রচনা করবে এ মহাভারত!

কে রচনা করবে তাঁর ভারত থেকে অন্তর্ধান ও ভারত অভিযানের সঠিক, সুসমঞ্জস ও সংহত ইতিহাস—১৯৪১ সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের কাহিনী?

কারও কারও ধারণা বিদেশী রাষ্ট্রের কারাগারে অথবা আশ্রমে সুভাষচন্দ্র আছেন—আবার কারও কারও ধারণা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীরূপে আশ্রমে আছেন তিনি।

বিমান-দুর্ঘটনায় টোকিও-এর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ সত্য কিনা তাও বলা যায় না!

জীবন-মৃত্যুর রহস্যের অন্তরালে আজ পরাধীন ভারতের মুক্তি-বিধায়ক সুভাষচন্দ্র।

চির অমর নেতাজী সুভাষ।